সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • মে-জুন ২০১৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

ইব্রাহীম সোবহান
'বাড়ির কাজ'
বন্ধের প্রবক্তা

উজানচর কংশ নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় : শতবর্ষের বিদ্যাপীঠ

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের নিবন্ধ : স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগ

শিক্ষালোক
সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

সম্পাদকীয়

মে-জুন ২০১৫ ● ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের একটি আত্মজীবনীমূলক লেখা, ব্রাহ্মণবড়িয়ায় বাঞ্ছারামপুরের শতবর্ষের বেশি বয়েসি একটি স্কুল ও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব ইব্রাহীম সোবহানকে নিয়ে এবারের সংখ্যাটি সাজানো হলো।

সম্প্রতি প্রয়াত ইব্রাহীম সোবহান ব্যতিক্রমী চিন্তা করতেন আর মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজে নিবেদিত ছিলেন। তিনি 'বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি'র প্রবর্তক। এ পদ্ধতিতে স্কুলের পড়া স্কুলেই শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব। শিশুকে আর বাড়ি গিয়ে স্কুলের পড়া তৈরির ভাবনা করতে হয় না। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য এ যে কত বড় একটা কাজ তা সুবিধাভোগী লোকজনের কাছে বোধগম্য নয়। এই চিন্তাশীল কর্মবীর মানুষটি গত বছর ২৯ নভেম্বর দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণের কথা মনে রেখে বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়ে ইব্রাহীম সোবহান সাহেব নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আমরা তাঁর চিন্তার মূল দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যাতে ভবিষ্যতে তাঁর চিন্তা ও কর্মের নানা দিক নিয়ে আরো আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমরা যেরকম শিশুদেরকে পড়াই, ইব্রাহীম সোবহান তাদের কথাই ভেবেছেন। আমাদের সংস্থার সঙ্গেও তাঁর একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। চলতি সংখ্যার কয়েকটি লেখার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা।

সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

প্রচ্ছদের ছবি
চেতনায় তোমার রূপের বিভাস
শিল্পী স্বপন আচার্য

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।
Email : cdipbd@yahoo.com, web: www.cdipbd.org

স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগ

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

বাল্যকাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আমার বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ। স্বদেশে গৃহে অবস্থানকালে প্রত্যেক পরিবারের বধূদিগের দুঃখ দুরবস্থা ও তাঁহাদের প্রতি শ্বাশুড়ী ননদ প্রভৃতির অত্যাচার দর্শন করিয়া আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। এইরূপ নিপীড়ন ও নির্যাতনের ভিতরে থাকিয়া তাঁহাদের মনোবৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল না, জ্ঞান-পিপাসা কিছুই চরিতার্থ হইতেছিল না। ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাগণও বধূরূপে দাসীর ন্যায় দিবারাত্রি খাটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হন, প্রায় কাহারও হইতে আদরযত্ন লাভ করেন না, কাজে একটু ত্রুটি হইলে গঞ্জনা ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাঁহাদের মুখ ফুটিয়া কথা কহিবার স্বাধীনতাটুকু নাই। এ সকল দেখিয়া মনে ক্লেশ পাইতাম, ভাবিতাম লেখাপড়া না শিখিলে, আত্মোন্নতি না হইলে, ইহাদের অবস্থার উন্নতি, স্বাধীন চিন্তা, মানসিক স্ফূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। লেখাপড়া শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া আমি জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সমুদ্যোগী হই। পাঁচদোনা নিবাসী কৃতবিদ্য আত্মীয় যুবা কৈলাসচন্দ্র সেন ও বসন্তলাল সেন এ কার্য্যে আমার বিশেষ সহায় হন। বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনে অনেক বাধা-বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, ভদ্র পরিবারের অনেকগুলি বালিকা ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষা আরম্ভ করে। পাঁচদোনার ভূতপূর্ব্ব সার্কেল পণ্ডিত সুচরিত্র শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিদিন প্রাতে যত্নপূর্ব্বক ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দান করেন। পরে গবর্ণমেন্ট হইতে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পাওয়া যায়। অনেকগুলি ভদ্র পরিবারের বালিকা উক্ত পাঠশালায় প্রথম শিক্ষালাভ করিয়া বিবাহান্তে স্বামীর বা অন্য আত্মীয়ের সাহায্যে শিক্ষার উন্নতি করিয়াছে, অনেক ছাত্রী প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল হইতে পাঁচদোনার বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেছে। কখন কখন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের উপক্ষো ও অযত্নে এই পাঠশালার কার্য্য কিছুকাল বন্ধ ছিল, আবার চেষ্টাযত্ন করিয়া পুনরায় কাজ চালান গিয়াছে। কলিকাতা হইতে আমি ছাত্রীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সময় সময় সুন্দর সুন্দর গল্পের বই, ছবির বই, নানা প্রকার খেলার সামগ্রী পাঠাইয়া থাকি। আমি ময়মনসিংহে যখন শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখন তথায় বালিকাবিদ্যালয় ছিল না, কোন পরিবারে পারিবারিক শিক্ষার ও বালিকাদিগের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমি মূড়াপাড়ার ভূম্যধিকারী এবং তত্রত্য কলেক্টরীর খাজাঞ্চী আমার পরমাত্মীয় বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার ময়মনসিংহস্থ আবাসে প্রথমে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করি। তাঁহার দুইটি কন্যা এবং অন্য ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকগুলি কন্যা সেই বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করে। আমি কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ না করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ন্যূনাধিক তিন ঘণ্টাকাল বোধ হয় দুই বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছিলাম। কলেক্টর রেণাল্ড সাহেবের পত্নী দুই বার উক্ত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন, এবং একবার পারিতোষিকস্বরূপ নানা প্রকার সিলাই করার ও খেলার সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন। পরে আর আমার সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের অবকাশ হইয়া উঠে নাই, আমার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্কুলের কার্য্য বন্ধ হয়। বহুকাল পরে ঠিক সেই স্থানে বৃহদাকার বালিকা বিদ্যালয় হয়, গবর্ণমেন্ট ভূম্যধিকারীদিগের অর্থসাহায্যে তাহার কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। পুরুষছাত্রদিগের অনুকরণে মেয়েরা শিক্ষা পাইয়া সেই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে।

> স্বদেশে বিদেশে যে স্থানে যে কোন মহিলা লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেছেন শুনিয়াছি তাঁহার সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি হইয়াছে, আমি তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। কিয়ৎকাল হইল, আমি পারিবারিক-জীবন পুস্তকরচয়িত্রী আমার ভাগিনেয়-বধূকে (কে.জি. গুপ্তের পত্নীকে) উক্ত পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম

ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের পণ্ডিতের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় ১৩নং মির্জাপুর স্ট্রীট ভারতাশ্রমে স্থিতি করিলে পর ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন আমার প্রকৃতি ও রুচি বুঝিয়া আমাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের

শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। আমি ছাত্রীদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াইতাম, আমার নামে কিছু বেতন নির্দ্ধারিত ছিল, উহা আমি গ্রহণ করিতাম না, প্রচারভাণ্ডারে অর্পিত হইত। কয়েক বৎসর এ কার্য্যে আমাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। পরে দেশদেশান্তরে প্রচারের সঙ্গে আর শিক্ষকতা চলে না বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হয়। আমি স্ত্রীলোকের জ্ঞানোন্নতিবিধায়িনী বামাবোধিনী পত্রিকার বহুকাল নিয়মিত প্রবন্ধলেখক ছিলাম। পরে আমারই প্রস্তাবে ও উদ্যোগে নারীদিগের জন্য পরিচারিকা নাম্নী মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহার সম্পাদকীয় পদ গ্রহণ না করিলেও বহুকাল আমি একজন নিয়মিত লেখক ছিলাম। আজ ১২ বৎসর যাবৎ মহিলা পত্রিকা আমা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে; মহিলার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অনেক মহিলার ধর্ম্মহীনতা, অস্বাভাবিক সভ্যতা ও বিবীয়ানার বিরুদ্ধে দুঃখের সহিত আমাকে কখন কখন সমালোচনা করিতে হয়, তাহাতে আমি জানি জ্ঞানাভিমানিনী নব্য মহিলারা, বিশেষতঃ কোন কোন উপাধিধারিণী মহিলা তাহা পড়িয়া ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হন; কিন্তু মহিলা তাঁহাদের পরম হিতৈষিণী, এক্ষণ না বুঝিলে আশা করি সময়ে বুঝিতে পারিবেন।

অপিচ যখন আমি ময়মনসিংহে নর্ম্মাল শ্রেণীতে পড়িতেছিলাম, বা অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিলাম; তখন স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক বনিতাবিনোদ-নামক পুস্তক পদ্যে রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলাম। উপরে সেই পুস্তকের উল্লেখ হইয়াছে। সেই সময়ে পাবনা নগরনিবাসী হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্রের পত্নী বামাসুন্দরী দেবী মহাবিদ্যাবতী বলিয়া বঙ্গদেশে অতিশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত একখানা পুস্তক পড়িয়া আমি আতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম, পত্রযোগে তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়, আমি তাঁহার স্বহস্তলিখিত দুই-তিনখানা পত্র পাইয়াছিলাম, তিনি আমাকে নিজের একজন হিতৈষী বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। বামাসুন্দরী দেবী বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছিলেন। আমি অনেকগুলি পুস্তক উৎসাহবর্দ্ধনার্থ তাঁহার স্কুলের ছাত্রীদিগকে দান করিবার জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। স্বদেশে বিদেশে যে স্থানে যে কোন মহিলা লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেছেন শুনিয়াছি তাঁহার সঙ্গে আমার আন্তরিক সহানুভূতি হইয়াছে, আমি তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। কিয়ৎকাল হইল, আমি পারিবারিক-জীবন পুস্তকরচয়িত্রী আমার ভাগিনেয়-বধূকে (কে.জি. গুপ্তের পত্নীকে) উক্ত পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তখন কে. জি. গুপ্ত উড়িষ্যা ডিভিশনের কমিশনর ছিলেন। বধূমাতা তাঁহার সঙ্গে স্থিতি করিতেছিলেন। সেই পত্র পাইয়া তিনি লিখিয়াছেন, "আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। জানি না আপনার মনে আছে কিনা। প্রায় ৩৭ বৎসর গত হইল আমি তখন মাত্র ১২ বৎসরের ছিলাম, তখন আমি আমার মাতুলকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম, আপনি সেই চিঠি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ময়মনসিংহের বিজ্ঞাপনী পত্রে তাহা ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। আপনিই সর্ব্বপ্রথম আমার লেখা কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বইখানি আপনার মনে আনন্দ প্রদানে সমর্থ হইয়াছে, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।" ২৭শে সেপ্টেম্বর, কটক।

আমি সেই প্রথম বয়সে লেখাপড়া করেন এমন অনেক মহিলাকে নানাভাবে উৎসাহ দান করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে হিতৈষী বন্ধু বলিয়া আদর করিয়াছেন ও পত্রাদি লিখিয়াছেন, বা দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া আত্মীয়তাবর্দ্ধন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক পরলোকগত রামমাণিক্য সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা পরলোকগত ঈশানচন্দ্র চন্দের পত্নী শ্রীমতী উত্তমা সুন্দরী একজন। আমি তাঁহার রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার কতকগুলি পত্র ও প্রবন্ধ তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ বিজ্ঞাপনী পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়াছিলাম, ক্রমে তাঁহাকে কতকগুলি পুস্তক উপহার দিয়াছিলাম। পত্রাদিযোগে তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। তিনি আমাকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে আমি ঢাকা নগরে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার স্বামী ও পিতা তখন উপস্থিত ছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের দিন নানাপ্রকার পানভোজনের আয়োজন করা হইয়াছিল। উত্তমা সুন্দরী স্বহস্তে খাদ্যসামগ্রী সকল বহনপূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রণাম করেন, তৎপর একদিন নিজে রন্ধন পরিবেশন করিয়া আমাকে ভোজন করান। তখন হইতে রামমাণিক্য সিংহ ও তাঁহার সন্তানবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা হয়। পূর্ব্বে এই পরিবারের সহিত আমার কোনরূপ আলাপ-পরিচয় ছিল না। তখন উত্তমার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, পরে কন্যা সন্তান হয়। কন্যা উত্তমা কর্ত্তৃক আমাকে মামা সম্বোধনে উপদিষ্ট হইয়াছিল। ঢাকা নগরে উপস্থিত হইলে আমাকে রামমাণিক্য সিংহ ও উত্তমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে হইত, উত্তমাও সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেন। এক্ষণ আর সেই প্রকার ঘনিষ্ঠতা নাই।

কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন
(জন্ম: ১৮৩৫ - মৃত্যু: ১৯১০)

উজানচর কংশ নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়

এ. কে. ফজলুল বারি

[২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শত বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন কমিটি একটি স্মরণিকা প্রকাশ করে। এতে বিদ্যালয়টি স্থাপনের ইতিহাস, বিভিন্ন সময়ে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের খবর, বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী সম্পর্কে তাঁদের ছাত্রদের স্মৃতিচারণ, শিক্ষা ও ভাল শিক্ষক হওয়ার গুণাবলী সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, রম্যরচনা, প্রাক্তন ছাত্র যারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের তালিকা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। ১৯০৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত যারা এ বিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন তাদের সকলের নামের একটি তালিকাও সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি স্মরণিকাটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের লেখা সমন্বয় করে রচনা করা হল। যাদের প্রচেষ্টায় এবং লেখনিতে এ স্মরণিকাটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।]

ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে শিক্ষা যখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন কেবলমাত্র শহরবাসী স্বল্পসংখ্যক বিত্তবান ও সুবিধাভোগী লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তখন উজানচর নামে এক প্রত্যন্তগ্রামের জমিদার পরিবারের বিদ্যানুরাগী দুই মহানুভব ব্যক্তির উদ্যোগে 'উজানচর কংশ নারায়ণ বিদ্যালয়'টি স্থাপিত হয় ১৯০৫ সালে। ঐ দুই মহানুভব ব্যক্তি হলেন স্বর্গীয় বাবু ভগবান চন্দ্র রায় এবং স্বর্গীয় বাবু দ্বারকানাথ রায়। এঁরা দুজন ছিলেন খুড়তুত ভাই। এঁদের ঠাকুরদা স্বর্গীয় কংশ নারায়ণের নামে উক্ত বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়।

স্কুলটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল আউয়াল ও প্রাক্তন ছাত্র জনাব মো: আফতাবুদ্দিন লেখেন, "স্কুল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জমিদার ভ্রাতৃদ্বয় স্কুলটি দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করা তাদের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষকদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান ও জায়গীরের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি স্কুল সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই তাঁরা সদাসর্বদা ভাবতেন। স্কুলের জন্মলগ্ন থেকেই বাবু দ্বারকানাথ চন্দ্র রায় স্কুলের সেক্রেটারির পদ অলংকৃত করে আসছিলেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার মাত্র ২২ বছর পর ১৯২৭ সনে বাবু দ্বারকানাথ চন্দ্র

উজানচর কংশ নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ রায় এবং ভগবান চন্দ্র রায়

রায় সন্তানসম যতনে পালিত স্কুলটিকে রেখে অকালে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাবু ভগবান চন্দ্র রায় স্কুলের আজীবন সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে ১৯৪৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। স্কুলের যে কোন আর্থিক প্রয়োজনে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। বাবু ভগবান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দীনেশ চন্দ্র রায় আজীবন স্কুলের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে পরলোকগমন করেন।"

স্কুলটির স্বীকৃতি সম্পর্কে লেখকদ্বয় লিখেন, "১৯০৫ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯০৭ইং সালে এর পরীক্ষার্থীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রথম অনুমতি পায়। প্রথম বছরই গুণগত এবং সংখ্যাগতভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যালয়টি ঐ ১৯০৭ইং সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী স্বীকৃতি লাভ করে। নিঃসন্দেহে পরম গৌরবের বিষয় যে, প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বছর পর একটি স্কুল স্থায়ী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুলের তালিকাভুক্ত হয়।"

উজানচর গ্রামটি তৎকালীন ত্রিপুরা, পরবর্তীতে কুমিল্লা এবং বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় অবস্থিত। তিতাস নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত এক মনোরম নৈসর্গিক পরিবেশে এ স্কুল। নদীর ওপারেই হোমনা উপজেলা। বাঞ্ছারামপুর ও হোমনা উপজেলার এটি একটি প্রাচীনতম স্কুল। তখনকার দিনে টিনের চালা ও টিনের দেয়ালের স্কুল ভবনটির সৌন্দর্য্য যে কোন সুরম্য অট্টালিকাকেও হার মানাত। স্কুলটি ৬ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্কুলের কাছেই রয়েছে বাজার, জমিদার বাড়ি, তহশিল অফিস, নদী পারাপারের খেয়াঘাট, লঞ্চ ঘাট ইত্যাদি। তাছাড়া আবাসিক ছাত্রদের জন্য হোস্টেল, খেলার মাঠ, মসজিদ, পুকুর সংলগ্ন হেডমাস্টারের আবাসিক ভবন, ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য পাকা পায়খানা, নলকূপ। উজানচরের মত এত ঐতিহ্যবাহী স্কুলের সংখ্যা এ অঞ্চলে প্রায় নেই বললেই চলে।

বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এর প্রাক্তন ছাত্র, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটির সভাপতি জনাব এম. এ. জাহের লিখেছেন, "বর্তমান সময়ে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকলেও সে সময় উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়টি ছাড়া এর ১৫ মাইল ব্যাসার্ধের ভিতর কোন স্থানে উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না; সারা বাঞ্ছারামপুর থানার এটিই ছিল একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়। বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদর হতে বিদ্যালয়টি অতি নিকটবর্তী।

উক্ত অবস্থান ও পরিবেশের ফলে এ বিদ্যালয়টি আমাদের অঞ্চলবাসী ও সে সময়কার পূর্ববঙ্গের বহু জনগণের মাঝে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষার আলো বিতরণ করতে থাকে। বিশেষ করে এ বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার অধিকাংশ লোকেরা গরিব ও নিম্নমধ্যম শ্রেণীর ছিল বিধায় নগণ্য সংখ্যক ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্যদের পক্ষে দূরের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা ব্যয়বহুল, কষ্টকর এমনকি সাধ্যাতীত ছিল। তাই, উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয় ধীরে ধীরে এ অনগ্রসর জনপদকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার ব্যাপারে অনন্য ভূমিকা রাখে।"

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ থেকে ১০০ বৎসরেরও বেশি সময়ে। এর প্রথম হেডমাস্টার ছিলেন বাবু বিধুভূষণ

রায়। তিনি প্রায় ৫/৬ বৎসর ঐ পদে বহাল ছিলেন। পরবর্তীতে আজ পর্যন্ত বর্তমান হেডমাস্টারসহ প্রায় ১০ জন হেডমাস্টার উক্ত বিদ্যালয়টি অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে 'শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন কমিটি' প্রতিষ্ঠাতা জমিদার দুই ভাইকে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র এলাকায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষার আলো বিতরণ করার মহান অবদানের জন্য ক্রেস্ট প্রদান করে সম্মাননা দেন। এঁরা হলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য:

১. স্বর্গীয় ভগবান চন্দ্র রায়

২. স্বর্গীয় দ্বারকানাথ রায়

যেসব শিক্ষকের জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা ও উঁচু মানের শিক্ষা পদ্ধতির ফলে উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের সুনামের ভিত স্থাপিত ও রক্ষিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় পাঁচ জনকে সম্মাননার প্রতীক হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে। এ শিক্ষকবৃন্দ হলেন:

১. স্বর্গীয় মহেন্দ্র চন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক, (কর্মকাল ১৯১০ - ১৯৩৮): সাফল্যের জ্যোতি ছড়িয়ে তিনি সুদীর্ঘ ২৮ বছর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের সুনামের ভিত-স্থাপনকারী এক অসাধারণ প্রধান শিক্ষক। তিনি ছিলেন জ্ঞানচর্চার মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, মেধাবী, দক্ষ ও আদর্শবান শিক্ষক।

২. স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রধান শিক্ষক (কর্মকাল ১৯৩৮ - ১৯৪৯): উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের সুনামের ভিত-স্থাপনকারী প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় মহেন্দ্র চন্দ্র দাসের সুযোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনিও ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বরেণ্য ও আদর্শ প্রধান শিক্ষক এবং জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত সুশিক্ষক।

৩. স্বর্গীয় জয়মঙ্গল সাহা, সহকারী প্রধান শিক্ষক (কর্মকাল ১৯৩০ পূর্ব - ১৯৪৯): তিনি ছিলেন উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-প্রধান শিক্ষক ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত শিক্ষার দিশারী।

৪. স্বর্গীয় কৃষ্ণধন সাহা, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক (কর্মকাল ১৯৩০ - ১৯৬১): স্বর্গীয় কৃষ্ণধন সাহা ছিলেন উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের এককালীন শীর্ষস্থানীয় মেধাবী ছাত্র এবং কর্মজীবনে জ্ঞানের দিশারী, নিবেদিত-প্রাণ বরেণ্য সুশিক্ষক।

৫. মরহুম আবদুল মজিদ, প্রথমে সহ. শিক্ষক ও পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক (প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মকাল ১৯৪৯ - ১৯৬২): মরহুম আবদুল মজিদ ছিলেন উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের এককালীন ছাত্র এবং কর্মজীবনের শুরুতে সহ শিক্ষক এবং পরবর্তীতে সুনামের ভিত-ধারণকারী প্রধান শিক্ষক।

স্মরণিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে এই শিক্ষকদের অসামান্য অবদানের কথা এবং তাঁদের শিক্ষা পদ্ধতি, ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী নিয়ে অনেক ছাত্রই স্মৃতিচারণ করেছেন। তেমন কয়েকজন পুরনো ছাত্রের কিছু কথা তাঁদের ভাষায়ই এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

জনাব আবদুল বারী লিখেছেন, "শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে যে কয়েকজনের স্মৃতি আমার মনের গভীরে দাগ কেটেছে তাদের নাম উল্লেখ না করলে বিবেকের দংশনে ভুগব। তাই অনেকের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন সম্পর্কে একটু বলব। বিদ্যালয়ের ক্লাশ শুরু হওয়ার মিনিট পাঁচেক পূর্বে দ্বিতীয় ওয়ার্নিং-এর ঘণ্টা বাজত; এ সময়ে দীর্ঘদেহী হেডমাস্টার সিংহপুরুষ দীনেশ বাবু সারা বিদ্যালয়ে একটা টহল দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে কলকোলাহল বন্ধ করে ছাত্ররা দৌড়াদৌড়ি করে যার যার ক্লাশে সিটে বসে যেত, বিরাজ করত একটা পিনপতন নিঃশব্দতা, আর শিক্ষকগণকে দেখা যেত ঠিকমত নিজ নিজ চেয়ারে বসে গেছেন। তৎপর ঘণ্টা বাজামাত্র শুরু হয়ে যেত ক্লাশ। এই কঠিন পুরুষটির কাছাকাছি মেশার সুযোগ আমার হয়েছিল, তাঁকে দেখেছি অতি সহানুভূতিশীল, এ যেন সেই লোকটিই নন। অন্য এক দরদী ব্যক্তি। অঞ্চল জোড়া নামকরা বিদ্যালয়ের অংকের শিক্ষক বাবু কৃষ্ণধন সাহার শিক্ষক ও ব্যক্তি হিসাবে তুলনা তিনি নিজেই। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাঁচ পাঁচটি লেটার ও স্টার মার্ক পান। গ্রাজুয়েশনের পর নিজ গ্রামে অবস্থিত উজানচর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তখনকার সময়ে বহু ছাত্র স্কুল থেকে অংকে লেটার মার্ক পেত, এটা শিক্ষক কৃষ্ণধন সাহার কৃতিত্ব। অংক ছাড়াও ইংরেজি, বাংলা ও অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি। বিরাট বপু নিয়েও তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ক্রীড়ানুরাগী, খেলাধুলায় পারদর্শী ও স্কুলের স্পোর্টস শিক্ষক। প্রতিদিন বিকালে তাকে দেখা যেত খেলার মাঠে, ক্রীড়ায় অংশ নিতে। অন্যান্য জ্ঞানী ও গুণী শিক্ষকের মধ্যে নাম করতে হয় প্রয়াত জয়মঙ্গল সাহা, মরহুম মহব্বত আলী বিএল, যাকে সবাই উকিল সাহেব বলেই চিনত। ওকালতি পাশ করেও মূল্যবোধের খাতিরে সারাজীবন তিনি শিক্ষকতা করে কাটান, বহুদিন মুন্সীগঞ্জের রামপাল উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তারপরে মনে পড়ে মরহুম আবদুল ওয়াহাবের নাম, পরে যিনি দুলালপুর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন, কালামিনার জগদীশ বাবু, জনাব আবদুল মান্নান দক্ষ শিক্ষক যিনি পরবর্তীতে উচ্চ প্রশিক্ষণ (এম.এ. এডুকেশন) নিয়ে সরকারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। আরও মনে পড়ে আরবী

একটি বিদ্যালয় ভাল হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক, সুষ্ঠ পরিবেশ, শিক্ষা-উপকরণ ...

- মো. সফিকুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
উজানচর কংশ নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়

(বাঁ থেকে) দ্বারকানাথ রায়ের দৌহিত্র নারায়ণ চন্দ্র রায়, প্রধান শিক্ষক বাবু নিতাই চন্দ্র সাহা ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. সফিকুল ইসলাম

উজানচর কংশ নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে এক আলাপচারিতায় জানা যায়, বর্তমানে স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১৮৭ জন আর মোট শিক্ষক ১৬ জন। এ স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার শতভাগের কাছে। খেলাধুলায়ও স্কুলটি বেশ ভাল। কয়েক বছর আগে তারা ফুটবল প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে খেলেছে। তাঁরা আরো জানান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখানে অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। শিক্ষকগণ ক্লাসপূর্ব জমায়েত ও অনান্য সময়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশ দেন। স্কুলে একটি ছাত্রাবাস রয়েছে, যেখানে পরীক্ষার আগে থেকে ভাল ছাত্রদেরকে এনে রাখা হয় ও তাদের পড়াশুনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

বাবু নিতাই চন্দ্র সাহা ২০০৯ সাল থেকে এখানকার প্রধান শিক্ষক। নারায়ণ চন্দ্র রায় দাতা সদস্য হিসেবে স্কুল কমিটিতে আছেন। স্কুল ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি কাজী জাদিদ-আল-রহমান এ স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. সফিকুল ইসলাম ১৯৮৭ সালে প্রথম এই স্কুলেই তাঁর শিক্ষকতা পেশা শুরু করেন। যোগদানের পর থেকেই স্কুলটিকে ভালবেসে ফেলেন ও কখনো শিক্ষকতা ছাড়া অন্য পেশার কথা ভাবেননি। ২০০৪ সালে তিনি উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষকের পুরস্কার পান।

একটি বিদ্যালয় ভাল হওয়ার জন্য কী-কী প্রয়োজন জানতে চাইলে জনাব মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, এর জন্য মানসম্মত শিক্ষক, সুষ্ঠ পরিবেশ, শিক্ষা-উপকরণ ইত্যাদি প্রয়োজন।

বর্তমানে মানসম্মত শিক্ষকের অভাব সম্পর্কে নারায়ণ চন্দ্র রায় বলেন, আগের দিনে সেরা ছাত্ররাই শিক্ষকতা পেশায় আসতো, কিন্তু আজ তা আসে না। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আরো জানান, তিনি এই স্কুলের শিক্ষক হিসেবে গর্ব অনুভব করেন, কারণ এই স্কুলের দীর্ঘদিনের সুনাম।

তিতাস নদীর পাড় ঘেঁষে স্কুলের একটি সীমানা-দেয়াল দেখিয়ে তাঁরা জানান, মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে মুক্তিযাদ্ধারা এখান থেকে পাকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

শিক্ষক, মরহুম মৌলভী কেনু মিঞা সাহেব; মরহুম মাস্টার ছায়েদ আলী, দক্ষ শিক্ষক ও স্পোর্টস গাইড, প্রয়াত ক্ষেত্রমোহন সাহা, অত্যন্ত নরম মেজাজের মানুষ।

দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী ও সুশৃঙ্খল শিক্ষার পরিবেশের কারণে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্র আসত এই বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য। স্কুলের বোর্ডিংয়ে যারা থাকত তাদেরকে ছাড়াও বহু ছাত্র চারদিকের নিকটস্থ গ্রামগুলির সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িতে জায়গির থাকত, সেই বাড়ির দুই একটি ছেলেকে পড়াত, দিক নির্দেশনা দিত ও নিজের পড়া চালিয়ে যেত। অনেকে আত্মীয় বাড়িতে থাকত।"

'স্মৃতিচারণ' নামে ড. মোহাম্মদ ইদ্রিস লিখেছেন, "স্কুল থেকে বের হয়েছি ৫২ বছর আগে। এতদিনে স্কুল জীবনের অনেক কথাই ভুলে গেছি। যে সকল কথা এখনও আবছা আবছা মনে আছে তাই স্মরণ করার চেষ্টা করছি। তখনকার দিনের সকল শিক্ষকের নামও সঠিকভাবে মনে পড়ছে না। তবে কোন কোন শিক্ষকের নাম ও কার্যক্রম ভালই মনে আছে। ১৯৪৯ সালে আমি যখন ক্লাশ সেভেনে ভর্তি হই তখন বাবু দীনেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাকে স্কুলের সকল ছাত্র-শিক্ষক শ্রদ্ধা করতেন, ভয়ও পেতেন। বয়স আনুমানিক চল্লিশের ঘরে, ফর্সা, লম্বা ও বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ক্লাস শুরু হলে বারান্দা দিয়ে চক্কর দিতেন। দেখতেন ক্লাশ টিচারগণ ঠিকমত ক্লাস নিচ্ছেন কিনা। একবার আমাদের এক ক্লাশ টিচার আমাদেরকে একটা লেখার কাজ দিয়ে চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছিলেন। হেড মাস্টার বাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন, তারপর দরজার পাল্লাটাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন। ক্লাশ টিচার শব্দ শুনে হকচকিয়ে উঠলেন ও জিজ্ঞেস করলেন, কে দরজাটাকে ধাক্কা দিল। আমরা বলছিলাম, হেড মাস্টার বাবু। ছাত্রদের সামনে বেশ একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন তিনি।

আমাদের প্রিয় শিক্ষক দীনেশ চন্দ্র সেনগুপ্তকে আমরা খুব বেশি দিন পাইনি আমার স্কুলে। আমি ভর্তি হওয়ার বছর দেড়েক পরই তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে যোগদান করেন। এর কিছুদিন পর কলেজের কাজে ট্রেনে কুমিল্লা যাওয়ার পথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি নিহত হন। তার অকাল মৃত্যুতে আমাদের স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। মানুষ নাকি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষকে আল্লাহ্ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও স্নেহ-মমতা দিয়ে তৈয়ার করেছেন অথচ এই মানুষই হিতাহিত জ্ঞান হারায়ে পশুর চেয়েও হিংস্র হয়ে উঠে যখন স্বার্থে আঘাত লাগে। একজন নিরপরাধ মানুষকে আর একজন বিনা কারণে খুন করতে পারে এটা ভাবতেও কষ্ট হয়।

বাবু দীনেশ সেনের পর ক্লাশ টিচারদের মধ্যে যাকে সবচাইতে বেশি ভাল লাগছিল তিনি বাবু কৃষ্ণধন সাহা। শুনেছি তিনি নাকি ডিগ্রী পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি বৃটিশ আমলের শিক্ষক। তখনকার দিনে ইচ্ছা করলে তিনি সরকারের বড় আমলা হিসাবে চাকরি নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি নিজ গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং একজন সফল শিক্ষক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কৃষ্ণধন বাবু আমাদের ক্লাশে অংক করাতেন। এত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তিনি বলতেন, ক্লাশের ছাত্ররা তা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত। কোথা দিয়ে সময় চলে যেতো টেরও পেতাম না। সব বিষয়ে তিনি পারদর্শী ও পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। অন্য কোন শিক্ষক ক্লাশে অনুপস্থিত থাকলে ঐসব ক্লাশেও তিনি আসতেন। ইংরাজি, ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ক্লাশও তিনি নিতেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মিলে দেশে বিদেশে অনেক শিক্ষকের কাছেই পড়েছি কিন্তু তাঁর মত এমন নিবেদিত প্রাণ ও দরদী শিক্ষক একজনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

ক্লাশে বসে কাউকে ঝিমুতে দেখলে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যেতেন। ক্লাশে ঢুকেই তিনি প্রথম আমাদেরকে জানালা বন্ধ দেখলে খুলতে বলতেন। ক্লাশে দেরি করে ঢুকতে দেখলেও তিনি খুব রাগ করতেন। আমাদের ক্লাশের এক সহপাঠীকে একবার দেরিতে ক্লাশে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, দেরি কেন? ঐ ছাত্র বলল, স্যার আমি অনেক দূর থেকে আসি। স্যার রেগে বললেন, 'You may come from Delhi but you must come on time.' ক্লাশ শেষে স্যার আমাদেরকে বাড়ির কাজ দিতেন ও এগুলি বাড়ি থেকে আনতে বলতেন। পরদিন জিজ্ঞেস করতেন অংকগুলো করে এনেছি কিনা। কেউ কোন একটি অংক না পারলে যে যে পেরেছে তাকে ডেকে নিয়ে বোর্ডে অংকটি করে দেখাতে বলতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়। আমরা তখন ক্লাশ টেনের ছাত্র। বাড়ির কাজের একটি অংক ক্লাশের কেউ করতে পারি নাই শুনে স্যার খুবই কষ্ট পেলেন ও নিজকে অপরাধী মনে করলেন। কোন কথা না বলে স্যার গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন, তারপর কিছু না বলেই ক্লাশ ছেড়ে চলে গেলেন। পরদিন ক্লাশে এসেই সবাইকে গালাগালি করতে লাগলেন ও বললেন, তোদেরকে এতদিন কি শিখালাম? ক্লাশ শুদ্ধ কেউ এই অংকটা পারলি না, তোরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করবি কেমন করে? মজার ব্যাপার, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় আমাদের ক্লাশ থেকে অংকে আমরা দশজন লেটার মার্ক পেয়েছিলাম, যদিও অন্য কোন বিষয়ে কেউ কোন লেটার মার্ক পাই নাই। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখনকার সময়ে শিক্ষকগণের প্রতি আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। শিক্ষকগণও স্নেহ, মমতা

ও একান্ত নিষ্ঠার সাথে ছাত্রদের সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন।"

নিকট অতীতে এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্র ড. মোহাম্মদ ফজলুল করিম তাঁর 'স্মৃতির পাতা থেকে' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় তিতাস নদীর পাড়ে সেই বিদ্যালয়টি আমার জীবনে প্রথম শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল একথা ভেবে আজও গর্ববোধ করি আমি। আমার ছেলেবেলার পুরোভাগ জুড়ে ছিল এই স্কুল। আমার পিতা মো: বজলে কাদির বিগত ৩৯ বছর যাবৎ ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। তন্মধ্যে প্রায় গত ৩০ বছর যাবৎ প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত। সেই সূত্রে স্কুল সংলগ্ন প্রধান শিক্ষকের বাসভবনেই ছোটবেলা থেকে বড় হই আমি। আমার আজও মনে পড়ে সেই পুকুর পাড়ের বাড়িটির কথা।

এখন থেকে একশত বছর পূর্বে এই এলাকায় অন্য কোন স্কুল ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাস্থান দখল করত এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা। আমি স্কুলে প্রায়ই সব ক্লাশে মেধাস্থানে প্রথম ছিলাম। ১৯৮২ সালে এই স্কুল থেকেই আমি এস.এস.সি-তে ৩টি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই এবং সরকারি বৃত্তি পাই।

এ পর্যায়ে স্কুলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কিছু না বললেই নয়। মাত্র কয়েকটি টিনের ঘর দিয়ে যে স্কুলের যাত্রা শুরু হয়েছিল সে স্কুলের আজ একটি দোতলা ভবনসহ সর্বমোট পাঁচটি বিল্ডিং। এছাড়া রয়েছে খেলাধুলার জন্য খেলার মাঠ, পড়াশুনার জন্য পাঠাগার এবং আধুনিক বিজ্ঞানাগার। স্কুলটিতে ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বহুমুখী সহ-শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে আজ অবধি বিদ্যালয়টি অত্র এলাকার শিক্ষার এক মহীরূহ হিসেবে অবস্থান করছে। ...

উজানচর কে. এন. হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা শুধু লেখাপড়া নয়, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তারা নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এ স্কুল তার শিক্ষার্থীদের যে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে তা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্য অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জীবনে বিদ্যালয়ের শিক্ষা, জ্ঞান-সাধনা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়ম-নিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা এবং সর্বোপরি শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি লাভ করুক এই কামনা করি।

বিগত এক শতাব্দী ধরে আমাদের এই প্রিয় বিদ্যাপীঠটি একজন আদর্শ ও কর্মঠ নাগরিক গড়ে তোলায় নিয়োজিত থেকে প্রকৃতপক্ষে মানুষ গড়ার আদর্শ কারখানা হিসেবেই কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সমাজে তার অবদান বড় করে দেখানোর চেষ্টা না করে বিনয়ের সাথে বলা যেতে পারে যে আমাদের সমাজে তার অবদান মোটেই ক্ষুদ্র নয়। এই মহতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই এক সময় আমি ছাত্র – একথা ভাবতে আমার গর্ব হয়। আমার শিক্ষা পরবর্তী কর্মজীবন বলতে গেলে এ স্কুলেরই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় পুষ্ট। তাই এ স্কুলের কথা লিখতে পেরে আমি যেমন কৃতজ্ঞ তেমনি আনন্দিত। কারণ স্কুলজীবনের কথা লিখতে বসে আমি আমার সেই পেছনের মধুর দিনগুলোতেই ফিরে যাচ্ছি। সেই স্মৃতি, সেই স্বপ্ন, কতো বন্ধুর মুখ, কতো প্রিয় শিক্ষকের সান্নিধ্য – একে একে সব কথাই মনে পড়ছে। আর ততই আমি আবেগাপ্লুত হচ্ছি, আমাকে নিয়ে যাচ্ছে পুরোনো সে দিনগুলোতে যখন তারুণ্যে, সজীবতায় ও স্বপ্নে আমিও বিভোর ছিলাম। আজ বুঝি সে দিনগুলো ফিরে পাবার কোন উপায় নাই।

উজানচর কে. এন. হাইস্কুলের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের, তার সুখ্যাতিও বহু পুরনো। আগামীদিনেও এই ঐতিহ্য ও সুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে। এ আশাই পোষণ করি। স্কুলের একজন প্রাক্তন ছাত্রের কাছে তার স্কুলের সুনাম সব সময়ই আনন্দের ও গৌরবের।"

১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯০৭ সালে এর পরীক্ষার্থীরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রথম অনুমতি পায়। প্রথম বছরই গুণগত এবং সংখ্যাগতভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যালয়টি ঐ ১৯০৭ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী স্বীকৃতি লাভ করে। নিঃসন্দেহে পরম গৌরবের বিষয় যে, প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার মাত্র দুই বছর পর একটি স্কুল স্থায়ী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুলের তালিকাভুক্ত হয়

এ বিদ্যালয় থেকে অনেক ছাত্র পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে তাঁদের কর্মজীবনে কৃতিত্বপূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শতবর্ষ উদযাপন কমিটি প্রথম পর্যায়ে এরূপ দশজন প্রাক্তন ছাত্রকে সম্মাননার প্রতীক হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করেছেন। এঁরা হলেন:

১. জনাব খলিলুর রহমান: ১৯৩৯ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্য। উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে প্রথম EPSFS. চাকরির শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের ফরেস্ট ডিভিশনের চিফ হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত।

২. মরহুম এম. এ. আউয়াল: ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্য। উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের প্রথম এবং পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম ব্যাচের PSP. পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

৩. মরহুম মোহাম্মদ হোসেন: ১৯৪৭ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্য। উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ১৯৫০ দশকের কাছাকাছি সালে EPCS প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব হিসাবে কর্মরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

৪. মরহুম ড. তাহেরুল ইসলাম: ১৯৫০ সালে উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ১৬তম স্থান লাভ করেন। কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে সিনিয়র অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

৫. জনাব এম. এ. জাহের: ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্য। উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে তিনি হলেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মিনারেল (জাহেরাইট)-এর আবিষ্কর্তা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ভূবিজ্ঞানীদের মধ্যে এমন কি বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে একক ব্যক্তিত্ব যার নামে মিনারেলের নামকরণ হয়েছে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদ হতে অবসরপ্রাপ্ত।

৬. ইঞ্জি. আবদুল আউয়াল: ১৯৫৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্য। বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল (১৯৬১), এম এস (আমেরিকা) ১৯৬৭, পরিবেশ প্রকৌশলী। উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে তিনিই একমাত্র জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গসংগঠন ইউনিসেফ (UNICEF)-এর উচ্চ পর্যায়ের পেশাগত কর্মকর্তা ছিলেন সুদীর্ঘ ২৫ বছর। UNICEF থেকে "Dedicated Service Award" প্রাপ্তদের মধ্যে তিনি একজন। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত।

৭. ড. মো: ইদ্রিস: ১৯৫৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্য। উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর সিনিয়র অধ্যাপক-এর পদ হতে অবসরপ্রাপ্ত। তথায় কর্মরত অবস্থায় এক সময়ে প্রো-ভিসি ছিলেন।

৮. ড. রাখাল চন্দ্র নাথ: ১৯৫৬ সালে উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৩য় স্থান লাভ করেন। কর্মজীবনে কলকাতাস্থ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কর্মরত।

৯. ড. এম. নূরুল ইসলাম: ১৯৫৬ সালে উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ১৬তম স্থান লাভ করেন এবং কর্মজীবনে কানাডাস্থ কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত।

১০. সঞ্জীব কুমার সাহা: ১৯৫৮ সালে উজানচর কে. এন. উচ্চ বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ৯ম স্থান লাভ করেন। ভারতের কোন এক প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

এবারে কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে লেখাটি শেষ করি। বিদ্যালয়টি থেকে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছিল ১৯০৭ সালে। তখন বলা হতো প্রবেশিকা বা এন্ট্রাস পরীক্ষা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। এটি চালু ছিল ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এ পরীক্ষার নাম ছিল ম্যাট্রিকুলেশন। ১৯৬০ সালে চালু হয় উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক (হাইয়ার সেকেন্ডারি ও স্কুল সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট) পরীক্ষা। এটি চালু থাকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। এরপর থেকে শুরু করে অদ্যাবধি চালু আছে গ্রেডিং পদ্ধতি।

উজানচর কংশ নারায়ণ বিদ্যালয় থেকে ১৯০৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৯৮ বৎসরে মোট ৩,৭৪৯ জন পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে পাশ করে ২,৩৪৬ জন; পাশের হার শতকরা ৬৩ জন। ১৯০৭ থেকে ১৯৫১ এই ৪৪ বৎসরে চারবার শতকরা ১০০ জন উত্তীর্ণ হয়। বিদ্যালয়ের ইতহাসে ১৯১৯-১৯২৫ এই ৭ বৎসর ছিল স্বর্ণযুগ। এই ৭ বৎসরে মোট ২৯৬ জন পরীক্ষা দেয়, পাশ করে মোট ২২৬ জন; পাশের হার ছিল ৭৬%। পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১৫২ জন (৬৭%) পায় প্রথম বিভাগ, ৬০ জন (৩০%) পায় দ্বিতীয় বিভাগ এবং মাত্র ৬ জন (২.৬%) পায় তৃতীয় বিভাগ। আমরা এ স্কুলের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং সাফল্য কামনা করি।

[এ. কে. ফজলুল বারি, বার্ড (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-কুমিল্লা)-এর প্রাক্তন পরিচালক। তিনি ও সিদীপ-এর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার পিতা মরহুম এ. কে. এম. নূরুল হুদা এ স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। তাঁদের পিতা নূরুল হুদা এ স্কুল থেকে ১৯২১ সালে অংকে লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।]

বাঞ্ছারামপুর জমিদার বাড়ি

আলোকচিত্র: আলমগীর খান

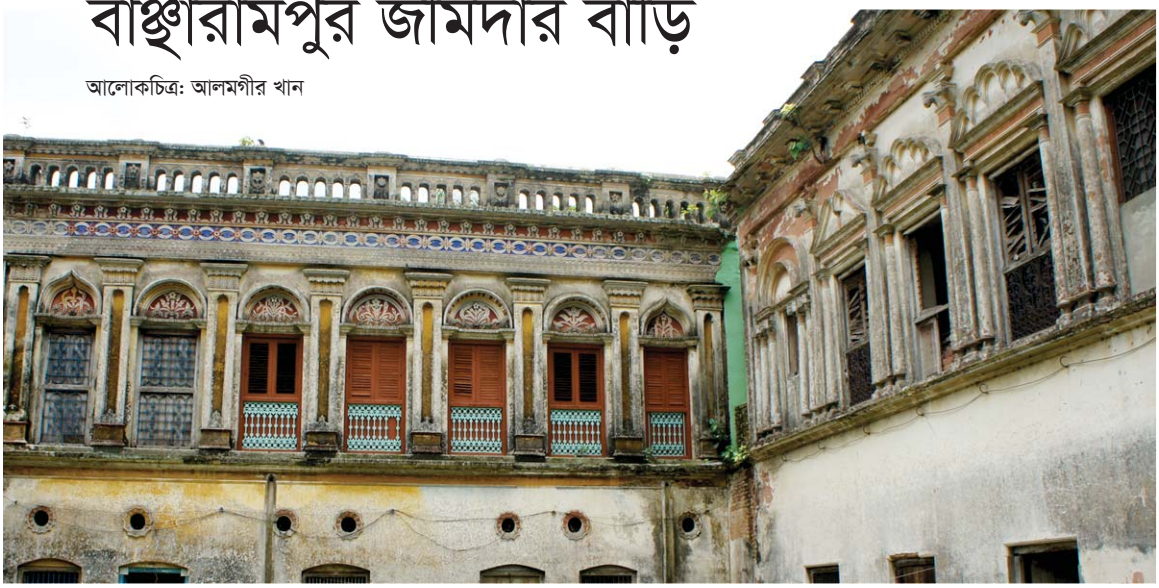

বাড়ির একাংশ

জমিদার বাড়ির প্রধান ফটক (ভিতর থেকে)

জমিদার বাড়ির মন্দির

বাহিরের একাংশ

ভানী গ্রামে ইঁদুর মারার কল তৈরি

কুমিল্লার দেবীদ্বারে ভানী গ্রাম ইঁদুর মারার কল তৈরির জন্য বিখ্যাত। প্রায় ৩ হাজার ভোটার অধ্যুষিত এ গ্রামের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ এই কল তৈরির সঙ্গে জড়িত। ভানী মধ্যপাড়ার মোট ৪০০ পরিবারের প্রায় প্রত্যেক বাড়ির লোকজন এটি তৈরি করে। ৩০/৩৫ বছর ধরে এখানে দড়ি দিয়ে শিকার কল তৈরি হত। এখন দুতিন বছর ধরে তারের জালির কল তৈরি হয়, যা এখানকার লোকজন মনে করেন তাদেরই উদ্ভাবন। পরিবারের সবাই মিলে এ কাজ করে। ছেলেমেয়েরা স্কুলেও পড়ে, আবার ইঁদুরের কল বানানোর কাজও করে। এ এলাকার মানুষের এটাই প্রধান পেশা, এরপর অন্যান্য।

ভাদ্র মাস থেকে এর মৌসুম শুরু হয়। ইঁদুরের কল তৈরিতে জিআই তার, স্ক্রু, পুরানো টায়ারের ভিতরের তার ইত্যাদি লাগে। বড়, ছোট ও মাঝারি এই তিন রকমের কল আছে। একজন ১ দিনে ৩০০টি কল বানাতে পারে। তবে আনুষঙ্গিক কাজের জন্য আরো ৬ জন লোক ও প্রায় ১০টি পরিবার যুক্ত থাকে। এর জন্য ৪০ কেজি তার লাগে আর খরচ হয় ৬ হাজার টাকা। যা বিক্রি হয় ৮ হাজার টাকায়। অর্থাৎ দৈনিক ২ হাজার টাকা লাভ থাকে। গ্রামের আজগর মেম্বারের বাড়িতে সপ্তাহে ৪ হাজার কল তৈরি হয়।

গ্রামের ৫০ বছর বয়স্ক আবু ইউসুফের ১ ছেলে ও ৩ মেয়ে। ছেলেটি গাড়ি চালায়। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে ও ছোট মেয়েটি স্কুলে পড়ে। গত বছর ২৫ মার্চ তার বাড়িতে তার সঙ্গে কথা হয়। তিনি সপ্তাহে ২৪০০ কল তৈরি করেন। এতে সব খরচ বাদে তার মাসে ১৫ হাজার টাকা আয় হয়। তিন-চার বছর আগে তিনি মাটি কাটা ও অন্যান্য কাজ করতেন। প্রথমে ৩৫ হাজার টাকা ধার করে ১০ হাজার টাকার তারের নেট কিনে তিনি ব্যবসায় নামেন। ২০০৭ সালে সিদীপ থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। গত বছর ৭০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কল তৈরির আয় দিয়ে তিনি ৫ লাখ টাকার দেনা শোধ করেছেন। তার মতে, ৪০ হাজার টাকার মত পুঁজি নিয়ে কেউ এ ব্যবসা করতে পারে।

ইঁদুরের কল তৈরি থেকে তাঁর আয় ও সাফল্যে তিনি গর্বিত। ভানী গ্রামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি এই ইঁদুরের কল তৈরি।

রমনা পার্কে স্বাস্থ্য রক্ষা

আশরাফ আহমেদ

ঘুম ভেঙে গেল, পাশে শোয়া আমার স্ত্রীর-ও। অন্ধকারে হাতড়ে সেল ফোনটি খুঁজলাম। আমার কাছে দুটো ফোন। গতকাল প্লেন থেকে নেমে গাড়িতে ওঠার আগেই আমার শ্যালিকা লিপি একটি ফোন হাতে দিয়েছিল, আর আবেদ ওর গাড়িতে ওঠার পর আরেকটি ফোন দিয়েছিল। একটি ফোন তুলে দেখলাম ভোর সাড়ে তিনটা। গতকাল বিকেলে ঢাকায় এসেছি। তার মানে ওয়াশিংটনে এখন দুপুর আড়াইটা। স্বাভাবিক অবস্থায় এখনতো আমাদের ঘুমানোর কথা নয়। কিন্তু এখানে রাত বলে আবারো ঘুমাতে চেষ্টা করে বিফল হলাম। সকাল পাঁচটা না বাজতেই একের পর এক আজান শোনা গেল। আমরা বাইরে হাঁটতে যেতে চাই শুনে আবেদ বললো একটু অপেক্ষা করলে নামাজ শেষ করে সেও যাবে আমাদের সাথে।

ইস্কাটন গার্ডেন রোড থেকে বের হয়ে স্টাফ কোয়ার্টার-এর ভেতর দিয়ে পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড পার হয়ে আমরা যমুনা রাষ্ট্রীয় অতিথিশালার সামনে এলাম। এটি পুরাতন গণভবন নামেও পরিচিত। এটি মিন্টু রোড এবং হেয়ার রোডের কোণে অবস্থিত। ভবনটির প্রায় উল্টোদিকে রমনা পার্কে ঢোকার গেট।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছালাম, সূর্য উঠতে তখনো অনেক দেরি। অথচ পার্কের ভেতর স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তির কমতি নেই। আমরা হেয়ার রোড বরাবর কিন্তু পার্কের ভেতরে হাঁটতে থাকলাম। ভেতরে একটি খোলা জায়গায় প্রায় জন তিরিশেক লোক নিজেদের মাঝে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে গোল হয়ে দাঁড়ানো। মাঝে দাঁড়িয়ে একজন সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলছে আর সবাই সমস্বরে চিৎকার করে তার প্রতিধ্বনি করে চলেছে। একটু শোনার চেষ্টা করাতে বুঝতে পারলাম ওরা নিজেদের স্বাস্থ্য ঠিক রেখে জীবন উন্নত করার প্রতিজ্ঞা করছে। তারপর শুরু হলো ব্যায়াম করার মত করে বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন।

আমরা হাঁটতে হাঁটতেই এই দৃশ্য দেখছিলাম বলে আমাদের গতি মাঝে মাঝেই শ্লথ হয়ে পড়ছিল। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকা লোক, আমাদের মত বোকা যারা নয়, তারা বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছিল। এভাবে চলতে থাকা লোকজনের মাঝে ছিল আপাদমস্তক চাদর দিয়ে জড়ানো বৃদ্ধ থেকে শুরু করে শুধুমাত্র গেঞ্জি পরে থাকা অল্প বয়স্ক যুবক, শুধু চোখ খোলা কিন্তু কালো বোরখায় আবৃত মহিলা থেকে শুরু করে ঝলমলে শাড়ি বা উজ্জ্বল রঙের সালোয়ার কামিজ পরা যুবতী, কেউ স্যান্ডেল পায়ে, কেউ অত্যাধুনিক দৌড়ানোর জুতা পায়ে। চল্লিশ বছর আগে ভোরে ঘুম থেকে উঠে পার্কে ব্যায়াম করা বা দৌড়ানো লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আর যারা ছিল তাদের প্রায় সবাই ছিল শক্ত-সমর্থ। সেই তুলনায় আজকের দৃশ্যটি দেখে আমার খুব ভাল লাগলো এই ভেবে যে বাংলাদেশের মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছে। অবশ্য শুধু আজকের দৃশ্য দেখে বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা কতজন সচেতন হয়েছে তা বলা যাবে না।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে আরেকটি জায়গায় দেখলাম, কজন ব্যক্তি নিজ নিজ মত ব্যায়াম করে চলেছে। কেউ দিচ্ছে বুক ডন, কেউ ঝুলছে লোহার শিক ধরে, কেউ লোহার শিক ধরে ঝুলে ঝুলে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাচ্ছে। বোঝা গেল পার্ক কর্তৃপক্ষ এই স্থানটিকে ব্যায়ামের জন্যই উপযুক্ত করে সাজিয়েছে। আরো কিছু দূর এগিয়ে গেলে গাছের নীচে কিন্তু খোলা এক জায়গায় আরো একদল লোককে দেখা গেল। তারা সমবেতভাবে উচ্চস্বরে হেসে চলেছে হা-হা-হা-হি-হি-হি শব্দ করে। আবেদ বললো, এরা শুধু এদের ফুসফুসের ব্যায়ামই করছে না, উচ্চস্বরে শব্দ করে এরা নিজেকে প্রকাশ করার মনের ও শরীরের প্রতিবন্ধকতা দূর করছে। এভাবে কিছুদূর পরপরই একেক দল লোককে দেখা গেল নিজ নিজ মত শরীরের বা মনের ব্যায়াম করে চলেছে।

হাঁটতে হাঁটতে কাকরাইল মসজিদের পেছনটায় চলে এলাম। এখানে পার্কে ঢোকার একটি গেইট আছে। গেইটের ঠিক মুখেই একটি টেবিল ও চেয়ার পাতা। টেবিল থেকে 'এখানে রক্তচাপ ও ব্লাড সুগার মাপা হয়' লেখা একটি পোস্টার ঝুলছে। টেবিলের ওপর একটি স্টেথিস্কোপ, কয়েকটি সিরিঞ্জ, এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে লেখা কয়েকটি ছোট ছোট পুস্তিকা। প্রাতঃভ্রমণ করতে এসে অনেক বহুমূত্র রোগী বা হৃদ-রোগী সামান্য কটি টাকার বদলে নিজের স্বাস্থ্যটি পরীক্ষা করিয়ে নিতে ভুলেন না। সেবা প্রদানকারীরও আয়ের একটি পথ হয়।

আমরা এবার রমনা লেকটির ধার ঘেঁষে হাটতে লাগলাম। পায়ে চলার এই পথটি এখনো অপেক্ষাকৃত নির্জন। রমনা বটমূলের কাছে পানির ধারে একটা বেঞ্চিতে আমরা বসলে আবেদ একাই ওর প্রাত্যহিক দৌড়টি সারতে গেল। আমাদের থেকে কিছুটা দূরে, পানির ঠিক ওপরে একটি বেদিতে এক লোক বসে আছে স্থির দৃষ্টিতে পানির দিকে তাকিয়ে। মনে হয় সে মেডিটেশন বা তপস্যায় মগ্ন। এই তপস্যা তার কতক্ষণ চলে তা দেখার ইচ্ছায় আমি বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম, কিন্তু আমরা তার পেছনে বলে সে আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না। আমাদের আরেক পাশে

পানির ধারে মনে হলো আরেক ব্যক্তি ছিপ নিয়ে বসে আছে। ইতোমধ্যে সূর্য উঠে গেছে, মানুষের পদভারে পার্কের বাতাস ধুলোয় ভরে গেছে। হঠাৎ আমার হাতের ফোন বেজে উঠলো, আমার ছোট ছেলে নাসিফ ফোন করেছে আমেরিকা থেকে, জিজ্ঞেস করছে আমরা সব ঠিকঠাক আছি কিনা। ওর গলাটি শুনে প্রাণটি আমার জুড়িয়ে গেল! প্রায় একই সময়ে দিনার হাতের ফোনটিও বেজে উঠলো, আমাদের বৌমা ফোন করেছে নর্থ ক্যারো-লাইনা থেকে আমাদের খোঁজ নিতে।

পানি থেকে মুখ ঘুরিয়ে পার্কের দিকে তাকাতেই বিখ্যাত রমনা বটমূলটি চোখে পড়লো। গাছটি বটগাছ হয়ে থাকলে এটিকে বটমূল বলা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমার পরিচিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন শিক্ষকের মতে এটি বট গাছ নয়, এটি পেকুর গাছ যা দেখতে বটগাছের মত কিন্তু ভিন্ন! দুটোই ডুমুর জাতীয় গাছ। তাঁর মতে পেকুর গাছ বট থেকে অনেক উঁচু, কৃষ্ণচূড়ার মত হয় এবং এর পাতা বটের পাতা থেকে অনেক পাতলা এবং অনেক সুচালো হয়। একই ভাবে পেকুর গাছে ঝুলন্ত শিকড় বট থেকে অনেক কম এবং বটের ঝুলন্ত শিকড় সাধারণত মাটির নিচে প্রোথিত হয়। এই সব বিবেচনায় রমনার 'বটবৃক্ষ'টি আসলে একটি পেকুর গাছ!

রমনার এখানে পহেলা বৈশাখের যে অনুষ্ঠানটিতে প্রথম এসেছিলাম তা সম্ভবত ১৯৭২ সনে, আমি তখন অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। সঙ্গে ছিল মাসুদ সিদ্দিকী নামে আমার এক রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী বন্ধু ও সহপাঠী। বছর বিশেক আগে সে ক্যান্সারে মারা যায়। সে বছর এখানে অনেক লোক সমাগম ছিল কিন্তু ভিড়ের মধ্য দিয়ে অনায়াসে হাঁটা যেতো। ছায়ানট আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানে আমরা প্রায় সামনের দিকেই বসেছিলাম ঠেলাঠেলি না করেই। আজকাল টেলিভিশনে যা দেখি তাতে মনে হয় পহেলা বৈশাখে এই বটমূলের কাছে তো নয়ই, ঢাকার কোন রাস্তাতেই পা রাখার জো থাকে না। আজকের পর এতো বিখ্যাত এই বটমূলের ধারেকাছে আসার সুযোগ নাও আসতে পারে। স্ত্রীকে তাই বললাম, চলো তুমি বটমূলে বসলে আমি একটি ছবি তুলে রাখবো। আর লোকজনকে দেখিয়ে বলতে পারবো সনজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন ও রেজোয়ানা চৌধুরী বন্যার মত তুমিও জীবনে রমনার বটমূলে বসেছিলে, হোক না তা বৈশাখের এক মাস আগে!

ফেরার সময় পার্কে লোকসমাগম এবং সাথে বাতাসে ধুলোবালি বেড়েই চলেছে, সবাই হন হন করে হাঁটছেন। একই দিকে বা উলটো দিকে চলতে থাকা লোকজনের কুশল বাক্য বিনিময় থেকে বোঝা গেল, সকালের এই রিচুয়ালটি শুধু স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, বন্ধুদের বা পরিচিতদের সাথে দেখা হওয়ারও এক ভাল ব্যবস্থা! কেউ এসেছেন পরিবারের ছেলেবুড়ো সবাইকে নিয়ে, কেউ অনেক বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে। যমুনা অতিথি ভবন গেইটের কাছে আসতে বাঁ দিকে একটি ছাউনি, তাকে ঘিরে অনেকগুলো বসার বেঞ্চি। তাতে অনেক মহিলার ভিড়। বড় ব্যানারে লেখা আছে কোন মহিলা সমিতির গানের জলসা। এদের সাথে অনেক হারমোনিয়াম, তবলা ও অন্যান্য শব্দ যন্ত্রও দেখা গেল। প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক আয়োজনের এই দৃশ্যটিও আমার কাছে নতুন হলেও সময় নেই বলে এদের কর্মকাণ্ড দেখার ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই বেরিয়ে আসতে হলো।

গেইট দিয়ে বেরিয়েই আরেক ধরনের ভিড়ে পড়লাম। রাস্তার দুই পাশে নানা ধরনের ফল ও সবজি সাজিয়ে বসেছে খুচরা বিক্রেতারা। ফলের মধ্যে আছে বেল, সফেদা, কলা ও আতাফল। এদের মাঝেই আছে কিছুদূর পরপর কয়েকটি রক্তচাপ ও ব্লাড সুগার মাপার টেবিল। একটি দোকানে উঁচু করে কচি ডাব সাজানো। আবেদ তার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো ডাব কেটে দিতে বললো। প্লাস্টিকের স্ট্র-টি ব্যবহৃত কিনা আবেদ তা যাচাই করলে তখনই আমরা ডাব থেকে পানি খেলাম। শুধু আমরাই নই অনেক লোকই পার্কের ভেতরে ব্যায়াম, দৌড় বা হাঁটা শেষ করে বাইরে এসে ডাবের পানিতে তৃষ্ণা মেটান। ফল ও সবজির অস্থায়ী দোকান যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে সারি বেঁধে দাঁড়ানো দামি দামি গাড়ি। ড্রাইভাররা তাদের বিত্তশালী মালিককে পার্কে হাওয়া খেতে বা দৌড়াতে নামিয়ে দিয়ে এখানে অপেক্ষা করছে।

লেখক আমেরিকা-প্রবাসী বাংলাদেশের প্রাণরসায়ন বিজ্ঞানী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে আমেরিকার একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে গবেষণার কাজ করছেন।

ইব্রাহীম সোবহান (৩১ মার্চ ১৯৫৪ - ২৯ নভেম্বর ২০১৪)

ইব্রাহীম সোবহান
নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তক

আইয়ুব হোসেন

ইব্রাহীম সোবহানের বাড়ি ফেনী জেলার দাগনভূঁইয়া উপজেলার জগতপুর গ্রামে। জন্ম ১৯৫৪ সালের ৩১ মার্চ। মৃত্যুবরণ করেন ২০১৪ সালের ২৯ নভেম্বর। একমাত্র কন্যা সন্তানের জনক ইব্রাহীম চাকরি করতেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে। একাডেমীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি এর সাথে যুক্ত ছিলেন। অতিক্রম করেছেন প্রায় তিনটি দশক এই প্রতিষ্ঠানে। শিশুদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিশু একাডেমীতে কেবলমাত্র সমাজের বিত্তবান ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা একাডেমী পরিচালিত কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পায়। ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিস ছাড়া দেশের ৬৩টি জেলায় শিশু একাডেমীর শাখা বিস্তৃত। সকল স্থানের চিত্র একই রকম। অর্থাৎ সমাজের ধনবান পরিবারের শিশুরাই কেবল একাডেমীর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। প্রান্তিক পরিবারের শিশুরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দূরে থাকুক, লেখাপড়ার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারে না। এর কারণ আমাদের কারো অজানা নয়। দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যজনিত অসচ্ছলতা। নিত্যদিনের অন্ন জোটানো যাদের সামর্থ্যে কুলোয় না শিক্ষা তাদের নিকট বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়! তাই অভিবাবকের ইচ্ছা থাকলেও, তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারেন না। লেখাপড়ার ব্যয় বহন করা যেহেতু তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই উপার্জনের কাজে তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়োজিত করা হয়।

শিশুর জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। অভিভাবকের নির্দেশে শিশু স্কুলে যায় বইয়ের বোঝা বগলদাবা করে। শিক্ষা পদ্ধতি শিশুর জন্য আনন্দদায়ক নয় বলে নির্বিচারে স্কুলে পড়া শেষে বাড়ি ফেরে। এইভাবে চলতে থাকার পর একসময় শিশু-শিক্ষার্থী পড়াশোনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলত ক্লাস ফাঁকি দেয়া শুরু হয়, হয় ড্রপআউট

ইব্রাহীম সোবহান চাকরিস্থলের ছেলেমেয়েদের উচ্ছলতা দেখেন আর তুলনা করেন তার অতীতের গ্রামীণ জীবনে দেখা কষ্টেসৃষ্টে বড় হওয়া গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের সাথে। অভিভাবকের দারিদ্র্য ছেলেমেয়েদের পেছনে টেনে ধরে রাখছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে আপাদমস্তক জর্জরিত এই সকল শিশুর মধ্যে অপার সম্ভাবনার দিগন্ত অবরুদ্ধ। সুযোগটা তাদের সামনে মেলে ধরতে পারলে নিজেরা তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে সমাজও উপকৃত হবে। দেশও অগ্রগতির কাতারে শামিল হতে থাকবে ক্রমশ।

সমাজের এই অমিল ব্যবস্থায় ইব্রহীম সোবহান ব্যথিত হন। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ক্রমান্বয়ে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। প্রচলিত ব্যবস্থায় কীভাবে দরিদ্র শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যায় সেজন্য তিনি ভাবনার দিগন্ত প্রসারিত করতে করতে একসময় এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। এরই আলোকে এক পর্যায়ে 'বিদ্যালয়- কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা' শিরোনামাঙ্কিত এক মডেল গড়ে তোলেন। যার সারকথা হলো - শিশুদের স্কুলের সময়সীমার মধ্যেই লেখাপড়ার পাঠ সম্পন্ন হবে। গৃহে লেখাপড়ার দরকার নেই বিধায় তারা অবসর সময়ে অভিভাবককে তাদের কাজেকর্মে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারবে।

সমাজের অনগ্রসরতার দুটি মৌলিক কারণ হলো - ১. দারিদ্র্য এবং ২. শিক্ষা ও সাক্ষরতার নিম্নহার। এই দুটো উপাদানই বস্তুত একসূত্রে গাঁথা। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা একটি স্বাধীন দেশ ও স্বাধীন জাতি প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় চরিত্রের মধ্যে কল্যাণ উপাদান আমরা এখনও সংযোজন করতে পারিনি। ফলত আমাদের রাষ্ট্রটির চরিত্র কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হবার সুযোগ পায়নি। এ কারণে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য - এটাও নিশ্চিত করা যায়নি। এ সকল বিবেচনায় ইব্রাহীম সোবহানের বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা দারিদ্র্য-পীড়িত শিশুদের লেখাপড়ায় একটা যুগান্তকারী শিক্ষা সংস্কার বলে অভিহিত করার অবকাশ রয়েছে। ইব্রাহীমের যে শিক্ষা পদ্ধতি তা দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের পাঠে উৎসাহী ও মনোযোগী করে তুলতে সক্ষম। এই মডেলের শিক্ষাদান পদ্ধতি ক্লাসের দৈর্ঘ্য এবং পরিবেশ-বান্ধব শিক্ষা ইত্যাদি সবমিলিয়ে অভিনব ধরনের উদ্ভাবন, শিক্ষাক্ষেত্রে এক সংস্কার সাধনের সম্ভাবনাবহুল।

ইব্রাহীম সোবহান মেক্সিকোতে তার শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছেন

বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতি শিশু-বান্ধব নয়। নয় বাস্তবমুখীও। যদি আলোচনার খাতিরে চলমান শিক্ষাক্রম আমরা যথাযথ বলে ধরেও নিই, তাহলেও এটা অনস্বীকার্য, যে পাঠদান পদ্ধতি শিশুর মানস অনুসরণ করে তা প্রয়োগ করা হয় না। শিশুর উন্নত মানস গঠনেও সহায়ক নয়।

বলাবাহুল্য, শিশুর জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতি আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। অভিভাবকের নির্দেশে শিশু স্কুলে যায় বইয়ের বোঝা বগলদাবা করে। শিক্ষা পদ্ধতি শিশুর জন্য আনন্দদায়ক নয় বলে নির্বিচারে স্কুলে পড়া শেষে বাড়ি ফেরে। এইভাবে চলতে থাকার পর একসময় শিশু-শিক্ষার্থী পড়াশোনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলত ক্লাস ফাঁকি দেয়া শুরু হয়, হয় ড্রপআউট। অন্যদিকে, দেশে দারিদ্র্যের মাত্রা সীমাহীন হওয়ায় অধিকাংশ পরিবারের শিশুদের পিতামাতার সঙ্গে কর্মে নিয়োজিত হতে হয়। ক্লাসগুলোর দৈর্ঘ্য (লেংথ অফ ক্লাস পিরিয়ড) এমনই যে সকাল-বিকাল ক্লাস চলে। এরপর অভিভাবককে উপার্জনের কাজে সহায়তা করার আর সুযোগ থাকে না। এর ফলে দরিদ্র অভিভাবকও একসময় সন্তানের লেখাপড়ায় নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন।

প্রচলিত এই বাস্তবতার আলোকে ইব্রাহীম সোবহান তার নিজ

দিল্লীতে অশোকা ফেলোগণের সঙ্গে ইব্রাহীম সোবহান

কোলকাতায় সেন্ট লরেটো স্কুলের অধ্যক্ষের সঙ্গে ইব্রাহীম সোবহান

উদ্ভাবিত শিক্ষাদান পদ্ধতি বিন্যস্ত করেছেন। তিনি তার পদ্ধতির শিরোনাম দিয়েছেন বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সারকথা তুলে ধরলে সোবহানের উদ্ভাবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। তার পদ্ধতির মূলগত লক্ষ্য হলো - স্কুলেই পড়াশোনার পর্বটি সমাপ্ত হবে। ক্লাস-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থী প্রয়োজনে অভিভাবককে অর্থনৈতিক বা গৃহকর্মে সহায়তা করতে পারবে। বাড়ি ফিরে তাদের আর লেখাপড়ার প্রয়োজন থাকবে না। গৃহশিক্ষক বা কোনো সহায়তাকারীর দরকারও হবে না। প্রচলিত ক্লাসের দৈর্ঘ্য অর্ধেকে নেমে আসবে। অর্থাৎ একটি ক্লাস-দৈর্ঘ্যে দুটি বিষয় পড়ানো যাবে। এভাবে এক বছরে তিনটি ক্লাসের পড়া হয়ে যাবে। বছরের যে কোনো সময় স্কুলে ভর্তি হওয়া যাবে। যে কোনো বয়সের এবং লিঙ্গের শিশু ও যে কোনো শিক্ষাগত পর্যায়ের শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পরবে। পরীক্ষায় একটি বিষয়ে খারাপ করলেও শিক্ষার্থীকে পাস করিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই বিষয়টির পড়া শেষ করতে হবে। এতে তারা ফেল করার ব্যথায় মুষড়ে পড়ে না। বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণকে সম্ভব সহজলভ্য উপকরণে আনন্দঘন করে তোলায় বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চা ছাড়াও পাজলিং, নাইস প্লে কর্নার, ওপেন ডোর গেম, প্লে এন্ড লার্নিং, ফ্রি প্লে ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এ সকল খেলাধুলার মাধ্যমে শিশু-শিক্ষার্থী তার অজ্ঞাতসারে লেখাপড়ার জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। মোটাদাগে ইব্রাহীম সোবহান উদ্ভাবিত বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্টগুলো যথাক্রমে -

১. গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীর পাঠদান, পাঠ প্রস্তুত ও পাঠ মূল্যায়ন শ্রেণীকক্ষেই সমাপ্ত করা, যাতে গৃহে পড়াশোনার প্রয়োজন থাকে না।
২. গৃহে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তার মাধ্যমে দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।
৩. শিক্ষার্থীর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আয়ত্তের দায়ভার শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত হওয়ায় জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
৪. শিক্ষক-শিক্ষিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করা। এবং
৫. শিক্ষার্থীদের শিশুবেলা থেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করা।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মসূচি

ইব্রাহীম সোবহান আধুনিক ও বস্তুবসম্মত শিশুশিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে তিন দশকেরও বেশিকাল গবেষণা করেছিলেন। এই গবেষণায় তিনি যতই গভীরে যাবার প্রয়াস চালিয়েছেন ততই বিভিন্নমুখী বাস্তবতা ও সমস্যা তার সামনে উপস্থিত হয়েছিল। এগুলোর আলোকে তিনি পুনরায় বিশ্লেষণ ও সমাধানে উপনীত হতে সচেষ্ট হয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইব্রাহীম বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া আরও কিছু কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেছেন। সেগুলো হলো -

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম
খ. দলভিত্তিক শিক্ষা
গ. আনন্দদায়ক শিক্ষা (জয়ফুল লার্নিং)
ঘ. বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা
ঙ. যথা শিক্ষা তথা আয়
চ. বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক নার্সারি ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
ছ. বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক হাঁস-মুরগি পালন
জ. চাইল্ড-টু-মাদার শিক্ষা পদ্ধতি
ঝ. গিভ এন্ড টেক পদ্ধতিতে বয়স্ক শিক্ষা
ঞ. সত্য শিক্ষা পদ্ধতি
ট. ওপেন ডোর শিক্ষা ইত্যাদি

নেপালে UCEP স্কুলের অধ্যক্ষের সঙ্গে ইব্রাহীম সোবহান

বিকেশি বাস্তবায়নের ফলাফল

ইব্রাহীম সোবহানের উদ্ভাবিত বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা (বিকেশি) পদ্ধতি সরকারের দুটি অধিদপ্তর, অন্তত এক ডজন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা এবং ২৫টিরও অধিক স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা তাদের পরিচালিত স্কুলে বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পভিত্তিক এই কার্যক্রমের মেয়াদ খুব দীর্ঘ হয়নি অর্থ বরাদ্দের অভাবে। তবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় যতটা স্কুলে এই পদ্ধতি চালিত হয়েছে সর্বত্রই অসামান্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমরা এই বক্তব্যের সমর্থনে অন্তত একটি থানার ফলাফল ও একটি সংস্থার মূল্যায়ন এখানে সংযোজন করতে পারি।

ক. ফলাফল: টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানায় ইউনেস্কো কমিশনের আর্থানুকূল্যে ১১০টি স্কুলে বিকেশি পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এর সময়কাল ছিল ১৯৮৩-১৯৮৬। এর মধ্যে ৫১০ জন শিক্ষককে পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সর্বমোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৭৫০০। উল্লিখিত মেয়াদে উপস্থিতির হার বেড়েছে ৪৪.৭৬ শতাংশ এবং ঝরে পড়ার হার কমেছে ৭ শতাংশ। এখানে সরকারিভাবে ১১ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি ডক্যুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করা হয়।

খ. মূল্যায়ন: ইউনেস্কো কমিশনের সহায়তায় ১২টি থানার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিকেশি পদ্ধতি চালু করা হয় ১৯৮৬-৮৭ সালে। স্কুলের সংখ্যা ছিল ৯৬৫টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬৫৩৭৫ জন। মূল্যায়নে দেখা গেছে, শিক্ষকবৃন্দ মতামত জানিয়েছেন এভাবে - পিরিয়ডের সময়সীমা ৯০.৫০ ভাগ 'অতি উত্তম' এবং ক্লাস রুটিন ৯০.৫০ ভাগ 'অতি উত্তম'। ইউনেস্কো সার্বিক মূল্যায়নে উল্লেখ করেছে অতি উত্তম (Excellent)।

একজন সফল সামাজিক উদ্যোক্তার প্রতিকৃতি

রাষ্ট্র বা সমাজে উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার স্পৃহা সৃষ্টি করতে চাইলে সমাজের অভ্যন্তরে নিয়ত পরিবর্তনমুখী কার্যক্রম চলমান রাখা প্রয়োজন। এটা স্বল্প সময়ের মধ্যে দৃশ্যমান হয় না বা উপলব্ধিও করা যায় না। একটা সময়ের মেয়াদান্তে একেকটি পরিবর্তন মূর্ত হয়ে ওঠে। সমাজের যারা অগ্রসর বা হিতকরী মানুষ তারা এই পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেন অথবা ইতিবাচক উপাদান সংযুক্ত করেন। এই প্রক্রিয়াতেই মানব সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। কল্যাণবাদী পরহিতকর মানুষ বলে পরিচিত হয়ে চেঞ্জ মেকার বা সোস্যাল হিরো হিসেবে গণ্য হন।

ইব্রাহীম সোবহান ব্যাপক পরিসরে তার উদ্ভাবিত কর্মসূচি সম্প্রসারিত করার সুযোগ পাননি। এটা সত্য যে ওই সুযোগ আয়ত্তে নিতে পারলে ইব্রাহীম সোবহানের বিদ্যালয়- কেন্দ্রিক

আজিজুর রহমান পাটোয়ারী পুরস্কার নিচ্ছেন ইব্রাহীম সোবহান

শিক্ষা ব্যবস্থার স্কুল সকলের চাক্ষুষ হয়ে উঠতে পারত। তবে ইতোমধ্যে দিনাজপুর, চাঁদপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, রাজবাড়ী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গাজীপুর, লাকসাম, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকাসহ কয়েকটি জেলার মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্কুলে এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের পর অসামান্য সাফল্য প্রতিভাত হয়েছিল। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ফুড ফর হাংরি ইন্টরন্যাশনাল, এমকিউসি, নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র, ইউনিসেফ, বেইস, নিজেরা শিখি, মহিলা আইনজীবী সমিতি, কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা, ডি উক, বিএসএসফ সাপোর্ট সেন্টার, স্বপ্ন ফাউন্ডেশন, বাইডস, নেসারিয়া সালেহীন একাডেমী, বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন স্কুল, পল্লী বিকাশ কেন্দ্র, আইআইআরডি, ইউসেপ, কপোতাক্ষ, কার্ড, আইএলও, শৈশব বাংলাদেশ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, ইউনেস্কো, সেভ দ্য চিলড্রেন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত তাদের স্কুলে সীমিত পরিসরে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করেছিল। এ সকল বিবেচনায় ইব্রাহীম সোবহানকে একজন চেঞ্জ মেকার বা সামাজিক উদ্যোক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা আশোকা ফর দি পাবলিক পৃথিবীর প্রায় ৬০টি দেশে তাদের নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেছে। এই সংস্থাটি বাংলাদেশে ইতোমধ্যে অনেককে সফল সামাজিক উদ্যোক্তা হিসেবে ফেলোশিপ প্রদান করেছে। ইব্রাহীম সোবহান বাংলাদেশে আশোকার প্রথম ফেলেশিপ লাভকারী একজন সামাজিক উদ্যোক্তা। এই বিরল সম্মাননা ইব্রাহীম ১৯৮৯ সালে তার সৃজনশীল কর্মযোগিতার বরাতে অর্জন করেছেন। তাছাড়া, তিনি আরও কিছু মার্যাদাপূর্ণ পদক-পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সেগুলো যথাক্রমে আজিজুর রহমান পাটোয়ারি

এওয়ার্ড-১৯৮৪ (শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী ও সমাজভিত্তিক শিক্ষার জন্য), ১৯৮৫ সালে দায়েমি কমপ্লেক্স এওয়ার্ড (শিশু শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য) এবং ১৯৯৮ সালে শিশুশিক্ষা গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন নাসির আলী পুরস্কার।

ইব্রাহীম সোবহান তার গবেষণালব্ধ এই শিক্ষা পদ্ধতি শুরুতে নিতান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালু করেন। এ সময় তিনি বই ভিক্ষা করে অথবা পুরোনো বই অর্ধেক দামে ক্রয় করে শিশুদের হাতে তুলে দেন। লেখার জন্য কলমের মাথা ও অব্যবহৃত ছোট পেন্সিল সংগ্রহ করে, মাথায় পুরোনো কলমের খাপ লাগিয়ে ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন। সেদ্ধ আলু খেয়ে উদ্বৃত্ত অর্থে স্কুল চালিয়েছেন। এরকম ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে ইব্রাহীম সোবহান মহতী এক শিক্ষা সংস্কারকর্মের সূচনা করেছিলেন। ইব্রাহীমের বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি পাঠদান ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন বলে প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমদিকে আপত্তি জানায় বা অনীহা প্রদর্শন করে। অভিভাবকরাও একই সময় এবং একই কারণে ইতস্তত করে। মানব সভ্যতায় অপরাপর সকল নব্য উদ্ভাবন প্রচলনে যে প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়েছে বা সচরাচর হয়, ইব্রাহীমের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

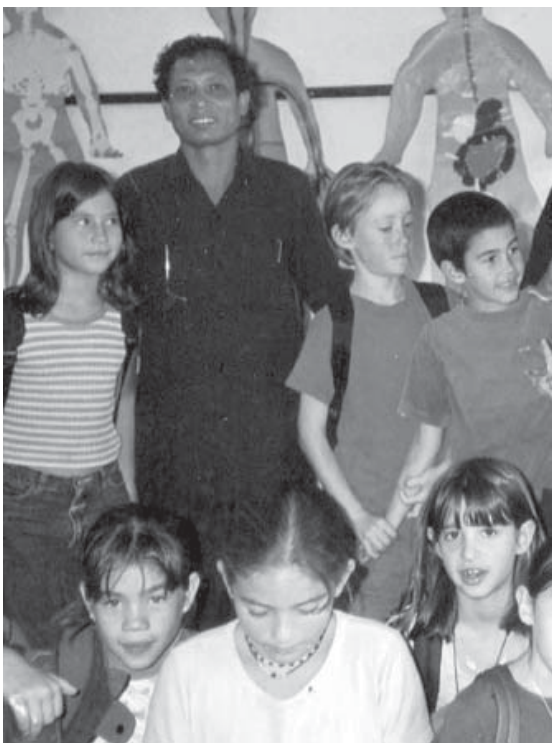

মেক্সিকোতে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইব্রাহীম সোবহান

মেক্সিকোতে অশোকা ফেলোগণের সঙ্গে ইব্রাহীম সোবহান

দারিদ্র্য মোচন

শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার - এই শ্লোগানটি আমাদের দেশে বস্তুত কথার কথা বৈ আর কিছু নয়। যদিও এটি আসলে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য সরল সত্য। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের রাষ্ট্রটি কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপ নেয়নি। এর ফলে শিক্ষা যে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এ বিষয়টি সুপ্ত থাকলেও বাস্তবে শ্লোগান সর্বস্বতায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষা বর্তমানে ক্রয়যোগ্য পণ্য। ব্যয়বহুল বিনিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। বিত্ত-বেসাতহীন দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের স্কুলে যাবার সামর্থ্য থাকে না। নিরক্ষরতা দারিদ্র্যের মাত্রা বাড়ায়, দারিদ্র্য জিইয়ে রাখে।

বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশু-শিক্ষার্থীর লেখাপড়া শেষ হয় শ্রেণীকক্ষেই। বিদ্যালয়ের বাইরের সময়ে শিশু ঝুঁকিমুক্ত উপার্জনশীল কর্মে নিয়োজিত হতে পারে। এতে পরিবারের জন্য যৎসামান্য হলেও উপার্জন যোগ করতে পারে। যা দারিদ্র্য মোচনে কিঞ্চিৎ অবদান রাখতে সহায়ক। শিক্ষা উন্নত জীবন গঠনের স্বপ্ন দেখায় এই স্বপ্নে তাড়িত হয়ে সফল জীবন আয়ত্ত করার দিকে ভবিষ্যতের নাগরিকরা ধাবিত হয়। সর্বোপরি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেশা বা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য নিশ্চিত করে। প্রকৃত বা জ্ঞানমুখী শিক্ষা অর্জন হলে তা হারিয়ে যাবার বা নষ্ট হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। শিক্ষা বস্তুত চিরস্থায়ী একটা মূলধনই বটে।

ইব্রাহীম সোবহান
স্কুলের ‘বাড়ির কাজ’ বন্ধের প্রবক্তা

আলমগীর খান

স্কুল থেকে দেওয়া ‘বাড়ির কাজ’ – আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি বিষফোঁড়া। এ ফোঁড়াটি সমগ্র শিক্ষাদেহে নানারকম ক্ষত তৈরি করেছে – যেমন গৃহশিক্ষকতা, নোটবই, কোচিং সেন্টার, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষায় নকল, স্কুলে পড়ানোয় ফাঁকি সহ আরো অনেক সমস্যা। শিক্ষাবিদ ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন একবার বেইজিংয়ের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এক আলোচনায় প্রাথমিক শিক্ষায় গৃহশিক্ষক ব্যাপারটি কিছুতেই তাদেরকে বোঝাতে পারছিলেন না। অনেক উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে ‘স্কুল থেকে দেওয়া বাড়ির কাজ’ জিনিসটা কি, এর চেয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বোঝানো সহজ হবে। অথচ গৃহশিক্ষকতা, বাড়ির কাজ ইত্যাকার জটিল বিষয়গুলো বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে ডালভাতের মতোই সহজ। এর কারণ এ দুটি বিষয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুটি বড় সংকট; সংকটের সঙ্গে আমাদের আজন্ম পরিচয়। স্কুল থেকে দেওয়া ‘বাড়ির কাজ’ শুধু সংকটই না, একটা বিষবৃক্ষ যা থেকে জন্মায় অন্য বহু সমস্যার ফলমূল। বিষবৃক্ষটি সার-পানি দিয়ে তরতাজা রেখে ওর ফলমূল ছেঁটে সমস্যা দূর করার যে প্রাণান্ত চেষ্টা আমাদের নীতিনির্ধারকগণ করে বেড়ান, তা মানুষকে বোকা বানানোর ফিকির মাত্র। কিন্তু এ দেশে একজন দরদী কর্মবীর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এ বিষবৃক্ষটি উপড়ে ফেলানোর যুদ্ধে নেমেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম ‘অশোকা ফেলো’ ইব্রাহীম সোবহান। বিষবৃক্ষের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সমূলে উপড়ে ফেলানোর আগে তিনি নিজেই জীবনের বৃক্ষ থেকে ঝরে গেলেন। ২৯ নভেম্বর ২০১৪ ষাট বছর বয়সে নীরবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তিনি। তবে মাঝখানে আমাদের জন্য মনে করার মতো কিছু কাজ করে গেছেন।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে চাকুরিকালে তিনি দরিদ্র পরিবারের শিশুদের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে দেখেছেন। ছেলেবেলার পল্লীর খেলার সাথীদের কথা তাঁর মনে পড়েছে। তাদের সকলেই জীবনযুদ্ধে সমান জয়ী হয়নি, হেরে গেছে অনেকেই। কারো ১ম, কারো ৫ম, কারো বা ১০ম শ্রেণির বেড়া ডিঙানো হয়নি, অনেকেই স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে। ইব্রাহীম সোবহান গভীরভাবে ভেবেছেন, কোনো শিশু ক্লাসে পড়ায় পিছিয়ে পড়ে ও এমনকি স্কুল থেকে ঝরে পড়ে কেন? এসব প্রশ্নের যেসব জবাব তিনি পেয়েছেন তা হলো: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা না থাকায় দরিদ্র শিশুদের প্রস্তুতির অভাব, রাতে পড়ার জন্য আলো বা কুপিতে তেলের অভাব, ঘরে পড়ার টেবিলের অভাবে বিছানায় ঝুঁকে বসে পড়ার অস্বাভাবিক ব্যবস্থা, বাড়িতে নিরিবিলি পড়ালেখার পরিবেশের অভাব, আয়-রোজগারে লেগে পড়া, সর্বোপরি ঘরে তাকে পড়াটা বুঝিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব ইত্যাদি। আমাদের দেশের ৮০ শতাংশের মতো বাবা-মা নিরক্ষরতার কারণে বা সারাদিনের অত্যধিক খাটুনি-ব্যস্ততা ইত্যাদি কারণে তাদের সন্তানকে পড়ালেখায় সাহায্য করতে পারেন না। কিন্তু স্কুলে শিক্ষকরা তো শিশুকে ‘বাড়ির কাজ’ অর্থাৎ বাড়ি থেকে পড়ালেখা শিখে আসার দায়িত্ব দিয়ে বসে আছেন। সংসারের কাজকর্ম করতেই তার দিন গুজরান হয়, ‘বাড়ির কাজ’ আর করা হয় না।

শিক্ষক-শিক্ষিকা শিশুকে ‘বাড়ির কাজ’ কেন দেন? না দিয়ে উপায় নেই। একটা শ্রেণিকক্ষে অনেক শিক্ষার্থী, সামনে পরীক্ষা, সিলেবাস শেষ করতে হবে। ক্লাসে এসে নাম ডাকা, পড়া ধরা, খাতা দেখা, হৈ-চৈ বন্ধ করা এসব সারতে সারতে আর সময় থাকে কৈ? ইব্রাহীম সোবহান হিসাব করে দেখিয়েছেন প্রতি ৩৫ মিনিটের ক্লাসে সব শেষে পড়ানোর

জন্য শিক্ষকের হাতে থাকে মাত্র ১০ মিনিট সময়। তো আজ আবার কালকের জন্য 'বাড়ির কাজ' দেওয়া ছাড়া কিইবা তার করার আছে! স্কুলটা হয় শুধু বাড়ির কাজ দেওয়া আর বাড়িটা হয় সেই বাড়ির কাজ মানে স্কুলের পড়া শেষ করার জায়গা। ব্যবস্থাটা অনেক দিন ধরে চলছে বলে এবং প্রতিযোগিতার হিসাবে এটি স্বচ্ছল পরিবারের স্বার্থের বেশ অনুকূলে বলে সবাইকে তা মেনে নিতে হয়। এরকম ব্যবস্থায় একমাত্র স্বচ্ছল শিশুরা গৃহশিক্ষকের হাত ধরেই কেবল স্কুলের পরীক্ষা-বৈতরণিগুলো পার হতে পারে, অন্য কেউ নয়। এরই নাম 'শিক্ষা'! বাকিরা ঝরে পড়ে। নিরক্ষর-দরিদ্র পরিবারের অনেক শিশু যে তারপরও পরীক্ষায় চোখ ধাঁধানো ফল পেয়ে বসে, তা মানুষের অলৌকিক ক্ষমতার কারণে, ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র।

সব সংকটের গোড়ায় যে দারিদ্র্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে সংকট দূর করার সাধ থাকলেও ইব্রাহীম সোবহানের সাধ্য নেই। তিনি উপায় খুঁজেছেন কি করে স্কুল থেকে 'বাড়ির কাজ' দেওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করা যায়। প্রস্তাব করেছেন, প্রতিটি ক্লাস পিরিয়ড বাড়িয়ে ৬০ মিনিট করার আর নাম ডাকা, খাতা দেখা ইত্যাদি বাতিল করে পুরো সময়টিকে পড়ানো ও ক্লাস টেস্টে ব্যয় করার। গান, খেলাধুলা ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে তিনি লেখাপড়াকে আনন্দময় করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমাদের দেশের পুরনো পাঠশালা ব্যবস্থা থেকে তিনি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছেন। পাঠশালা ব্যবস্থায় প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শিখিয়ে দেওয়া হতো। সেখানে বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে নয়, প্রতিদিনের কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করা হতো। শিক্ষক দল গঠন করে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে দলনেতা নির্বাচন করে তাদেরকে দলগতভাবে শেখার ব্যবস্থা করতেন। ইব্রাহীম সোবহানের পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায়ও বাড়ির কাজ নেই। এতে বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করার আতঙ্ক নেই, যেহেতু প্রতিদিনের মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা বছর শেষে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। দলগত শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জানাবোঝার বিনিময় হয় ও তাদের পড়ালেখা ভাল হয়। তিনি এ নতুন ব্যবস্থার নাম দিয়েছিলেন 'বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি'।

স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ঢাকার নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজে ১৯৭৮-'৮১ সালে তিনি গৃহকর্মী ও পথশিশুদের জন্য একটি স্কুল চালু করেন। স্কুল চালানোর খরচ যোগাতে এসময় তিনি ভাতের বদলে দৈনিক আলু সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকার অভ্যাস করেন। বাড়ি বাড়ি ধরনা দিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পুরনো ব্যবহৃত বই, খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি জোগাড় করেছেন। অনেকের দরজায় শুনতে হয়েছে 'মাফ করেন'। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষা পদ্ধতির উপর লেখা বইয়ের মুখবন্ধে এসব ব্যক্তিগত সংগ্রামের তথ্য দিয়েছেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও 'জনবিজ্ঞান' সাময়িকীর সম্পাদক আইয়ুব হোসেন। তিনি লিখেছেন, 'এরকম ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে ইব্রাহীম সোবহান মহতী এক শিক্ষা সংস্কারকর্মের সূচনা করেছিলেন।'

ইব্রাহীম সোবহানের চিন্তাভাবনার বড় দিক হলো, তিনি এমন সময়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কতগুলি মৌলিক প্রসঙ্গ তুলেছেন যখন এসব নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি। আর তিনি শুধু বড় বড় কথা বলেই দায় সারেননি, বরং তাঁর ভাবনাচিন্তা কার্যকর করার জন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিভিন্ন দেশি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নসংস্থা সেসময় তাঁর চিন্তা লুফে নিয়েছিলো। ইউনেস্কো কমিশনের অর্থানুকূল্যে বেশ কিছু সরকারি স্কুলেও এ পদ্ধতির আংশিক প্রয়োগ হয়। তাঁর পদ্ধতি প্রচারের জন্য তিনি ভারত, নেপাল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর অসুস্থতা, প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য ও অনেকের সদিচ্ছার অভাবে তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিটি স্বনামে হারিয়ে যেতে থাকে। তবে তাঁর চিন্তার ফসল এখনো অনেকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছেন। সম্প্রতি আমার সঙ্গে এক ফোনালাপে আইয়ুব হোসেন এ ব্যাপারে অভিযোগের সুরে বলেন, 'অনেক এনজিও ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইব্রাহীমের উদ্ভাবিত শিক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন দিক ও শিশুশিক্ষার্থীদের জন্য তাঁর লেখা বইপুস্তক একটু-আধটু পরিবর্তন করে নানাভাবে ব্যবহার করছে, কিন্তু কেউ ন্যূনতম ঋণ স্বীকার দূরে থাক, তাঁর নামও নিচ্ছে না।'

শিশুশিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি সত্যশিক্ষা কর্মসূচি চালু করেছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকেও যাতে সমাজের সর্বস্তরে নৈতিকচর্চার প্রসার ঘটে। তবে অনুষ্ঠানাদি করে সত্যিকার নীতিনৈতিকতার উন্নতি করা যায় কিনা, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আবার শিশুকে 'বাড়ির কাজ'-এর বোঝা থেকে মুক্ত করলেও তিনি তাদেরকে কাজের বোঝা থেকে মুক্ত করতে চাননি। নিঃসন্দেহে তিনি ভেবেছেন, দরিদ্র পরিবারের শিশুকে অভাবের তাড়ণায় তার বাবা-মা কাজে লাগাবেই। সেক্ষেত্রে তিনি তাদের দিয়ে আয়-রোজগারের বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে তারা নিজেদের পড়ালেখা নিজেরাই চালাতে পারে ও পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। এসবের মধ্যে সমাজের গলদ স্থায়ীভাবে দূর করার চেষ্টা নেই। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সকল অন্যায় দিক সর্বতোভাবে মেনে নিয়েই যাতে দরিদ্র শিশুরা পড়ালেখায় এগিয়ে যেতে পারে, এটাই তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির মূল দিক। এরকম পদ্ধতি অনেকের প্রিয়। বিদ্যমান গলদের সঙ্গে এই আপোষকামিতার ইচ্ছাকে বাদ দিলে, ইব্রাহীম সোবহানের শিক্ষাভাবনার মূল দিকটি দূরদর্শী, ফলে তাঁকে নিয়ে আরো আলোচনা প্রয়োজন।

[লেখাটি দৈনিক সংবাদ (৯ জুন ২০১৫) ও ইংরেজি দৈনিক অবজার্ভার (২২ মে ২০১৫) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।]

বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি : গ্রন্থ প্রসঙ্গ

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই সম্পন্ন হতে হবে শিশুশিক্ষার কাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম। নচেৎ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে না বরং অবধারিতভাবেই সুদূরপরাহত থেকে যাবে। পাঠপ্রস্তুতিসহ অন্যান্য বিষয়ে 'বাড়ির কাজ'-এর জন্য বেশির ভাগ শিশুর বাড়িতে উপযুক্ত পরিবেশ নেই। উপরন্তু উপার্জন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অংশগ্রহণ অধিকাংশ শিশুর জন্য আমোচনীয় বাস্তবতা।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)-এর (২১ আক্টোবর ২০১০) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের দুই কোটি ৯৬ লাখ শিশু দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এটা স্পষ্ট, এ শিশুদের শিক্ষা-কার্যক্রমের আওতায় আনতে হলে পূর্ণবৃত্তি প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে বিদ্যালয়ের পর শিশু তার পরিবারের উপার্জন সহায়ক হাত হিসেবে কাজ করলেও শিক্ষা-কার্যক্রমের সাথে তার বিচ্ছিন্নতা তৈরি না হয়। বিষয়টি বিবেচনায় এনে ১৯৭৮ সালে শিক্ষানুরাগী ইব্রাহীম সোবহান প্রণয়ন ও প্রচলন করেন বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি (School - Based Education System)।

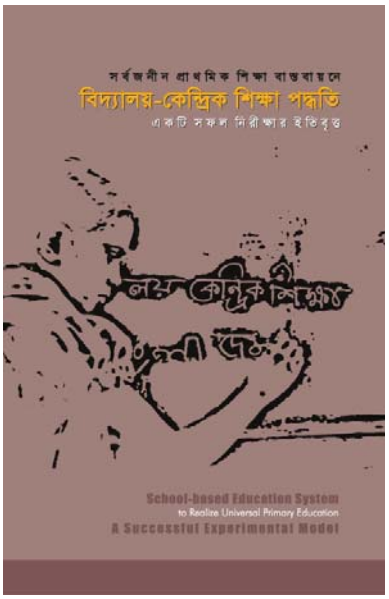

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি, একটি সফল নিরীক্ষা ইতিবৃত্ত
প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১০

ইব্রাহীম সোবহানের মতে, দেশের শতভাগ মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে হলে বিদ্যমান আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতিসহ সার্বিক বাস্তবতা বিবেচনায় আনতে হবে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা-কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর কোনো বিকল্প নেই।

ইব্রাহীম সোবহানের ভাষ্যমতে, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হলে দেশের দরিদ্র এবং হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (সিংহভাগ মানুষকে) বিবেচনায় আনতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে নিরঙ্কুশভাবে বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এ পদ্ধতিতে পাঠপ্রস্তুতিসহ শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই সম্পন্ন করার প্রস্তাব করেন তিনি।

সীমিত পরিসরে হলেও ইব্রাহীম সোবহান কর্তৃক 'বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা' শীর্ষক প্রকল্প এবং সম্পূরক গবেষণা সফলভাবে প্রমাণ করেছে, পাঠপ্রস্তুতিসহ শিক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সম্পন্ন করতে পারলে একই সাথে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির হার বৃদ্ধি পাবে এবং ঝরে পড়ার হার কমানো সম্ভব হবে। 'বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা' শীর্ষক পরীক্ষাধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের প্রকল্পের অভিজ্ঞতা সে কথাই বলে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা-কার্যক্রম সম্পর্কে শিশুর অনীহা দূর করে ইতিবাচক মনোভঙ্গি সঞ্চারের লক্ষ্যেও (আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে) ইব্রাহীম সোবহানের গবেষণা সাফল্য পেয়েছে। বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি ১৯৮৩ সাল থেকে তার প্রস্তাবিত প্রাক-প্রাথমিক আনন্দাদায়ক শিক্ষা পদ্ধতির ফলপ্রসূ প্রয়োগ ঘটে আসছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতে। ১৯৮৫ সালে তার প্রণীত প্রাক- প্রাথমিক শিশুপাঠ্য 'কিশলয় পাঠ'-এর ছয় লক্ষাধিক কপি মুদ্রণ ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছিল। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে জানুয়ারি ২০১১ সাল থেকে চালু হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-কার্যক্রম।

এ বইটিতে ইব্রাহীম সোবহান উদ্ভাবিত এবং পরিচালিত (১৯৭৮-১৯৯৭) 'বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা' প্রকল্প এবং এ প্রকল্পের সন্নিহিত সম্পূরক প্রকল্পসমূহের প্রাসঙ্গিকতা ও অভিজ্ঞতা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পসমূহের উপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবিদদের গবেষণা এবং নির্বাচিত কিছু মূল্যায়নও উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বইয়ের প্রথম দুটি পর্ব ইব্রাহীম সোবহানের প্রত্যক্ষ জবানি এবং সংশ্লিষ্ট পুরনো রচনা ও ম্যানুয়াল ইত্যাদির সমন্বয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী পর্বগুলোতে এ সংক্রান্ত প্রামাণ্য দলিলগুলো যথাসম্ভব সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ■ *জাহিদুল ইসলাম*

বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির রূপরেখা

ইব্রাহীম সোবহান

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, শিক্ষাকে গতিশীল, ফলপ্রসূ ও সর্বজনীন করার লক্ষ্য শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক, গৃহকেন্দ্রিক নয়। তারই আলোকে নির্ণয় করতে হবে পিরিয়ডের সময়সূচি, পিরিয়ডের সংখ্যা, পরীক্ষা পদ্ধতি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালীন শিক্ষার্থীর পাঠ দিয়ে তা বিদ্যালয়েই আদায় করার ব্যবস্থা করা, যেন শিক্ষার্থীকে বাড়িতে গিয়ে আর পাঠাভ্যাস করতে না হয় বা পড়ার প্রয়োজন হলে কোনো সাহায্যকারী ছাড়াই পাঠাভ্যাস করতে পারে। অন্য সময় বাবামাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাহায্য করতে পারে। যার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হয়। কারণ শিক্ষা ও দারিদ্র্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দারিদ্র্যের কারণে যেমন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হয়, তেমনি শিক্ষা না থাকলে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়। সেজন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে আয়মূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে পদ্ধতিগত কারণে শুরু থেকে শ্রেণীভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করতে না পেরে উচ্চ শ্রেণী সম্পর্কে ভীতি সৃষ্টি হয়। একসময় সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে।

বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

- শিক্ষার্থীর পাঠদান, পাঠপ্রস্তুত ও পাঠ মূল্যায়ন শ্রেণীকক্ষে সমাপ্ত করা যাতে গৃহে পড়ার প্রয়োজন না হয়।
- গৃহে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষক-শিক্ষিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষার্থীর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের দায়ভার শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত হওয়ায় জবাবদিহিতা সৃষ্টি করা।

পিরিয়ডের সময়সীমা বা দৈর্ঘ্য

বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পিরিয়ডের সময়সীমা ৬০ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীর পূর্ব-পাঠ অনুশীলন, নতুন পাঠ দান, পাঠ তৈরি, পাঠ মূল্যায়ন - সবই বিদ্যালয়ে শেষ করা হয়।

এভাবে দিনের পাঠ দিনেই শেষ হয় বলে পড়াশোনার প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার কমে আসে।

পিরিয়ডের সংখ্যা বা ক্লাস রুটিন

প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষককে দৈনিক ৬/৭টি বিষয়ে বাড়িতে পাঠ তৈরি করতে হয়। এর ফলে শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীর কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না সবগুলো বিষয় ভালোভাবে বোঝানো বা বুঝে নেয়া। এতে ছাত্রছাত্রীরা হয়ে পড়ে ক্লান্ত ও অমনোযোগী। শিক্ষকগণও অধৈর্য্য হয়ে পড়েন।

প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে ক্লাস রুটিনের বিভাজন হলো সকাল ১০.০০ টা (বর্তমানে ৩০ মিনিট বাড়িয়ে ৯.৩০ মিনিট) থেকে ১২.০০ টা পর্যন্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর চারটি পিরিয়ড হয়ে থাকে। মাঝখানে ১৫ মিনিট বিরতি থাকে। তারপর ১২.১৫টা থেকে ৪.১৫টা পর্যন্ত ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ৬টি পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে নামাযের জন্য ৩০ মিনিট বিরতি থাকে।

বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে স্বল্প সংখ্যক বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষকের পক্ষে যত্ন সহকারে পাঠ্য বিষয় পড়ানো সম্ভব হয়। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেও পাঠ তৈরি করা সহজতর হয়। এই পদ্ধতিতে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মন-মানসিকতা ইত্যাদির আলোকেই তৈরি করা হয়েছে ক্লাস রুটিন। এই ক্লাস রুটিন তৈরি করার পূর্বে ৪ বছর মাঠ পর্যায় বাস্তবায়ন ও ৯৬৫ জন শিক্ষকের মতামত নিয়ে (যার মধ্যে ৯০.৫০% 'অতি উত্তম' অভিমত দিয়েছেন) চূড়ান্ত করা হয়েছে - যার বিভাজন নিম্নে দেয়া হলো -

সকাল ৮.০০টা থেকে বিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হবে। ৮.০০টা থেকে ৯.০০টা এবং ৯.০০টা থেকে ১০.০০টা পর্যন্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর দুটি ঘন্টা অনুষ্ঠিত হবে। ১০.০০টা থেকে ১০.১৫ পর্যন্ত বিরতি। এই ১৫ মিনিটের মধ্যে দুই গ্রুপের সমাবেশ (এসেমব্লি) অনুষ্ঠিত হয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছুটি। পরে ১০.১৫টা থেকে ১২.১৫টা পর্যন্ত ২য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ১ম ও ২য় ঘন্টা অনুষ্ঠিত হবে।

তারপর নামাযের জন্য ৩০ মিনিট বিরতি। ১২.৪৫টা থেকে ১.৪৫টা ও ১.৪৫ থেকে ২.১৫ পর্যন্ত ৩য়, ৪র্থ পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হয়ে বিদ্যালয় ছুটি হবে। বিদ্যালয় শেষে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে ফিরে যেন খেলাধুলার সাথে সাথে পারিবারিক, বৈষয়িক ও আর্থিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে পারে, সেজন্য শিক্ষক তাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। বর্তমানে সরকারের ঘোষিত অতিরিক্ত ৩০ মিনিট কো-কারিকুলার কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরীক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়ন

শিক্ষা উন্নয়নে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতি। প্রচলিত নিয়মে আমাদের দেশে বছরে দুটি বা তিনটি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাশ-ফেল নির্ধারণ করা হয়। ফলে পরীক্ষা পাশের জন্য ছাত্রছাত্রীরা পরের খাতা দেখে লেখার অভ্যাস শুরু করে। এভাবেই নকলের ভিত তৈরি হয় প্রাথমিক শিক্ষা জীবনেই।

'বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি'তে শিশুদের পাঠ মূল্যায়ন, দৈনিক গল্প বা অধ্যায়ভিত্তিক ও সাপ্তাহিক পরীক্ষা ছাড়াও নিয়মিত মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে পরীক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের ভীতি ও মানসিক চাপ কমে আসে। নির্ধারিত মূল্যায়ন সিট অনুসারেই বর্ষ শেষে ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রমোশন দেয়া হয়।

অনুসরণ (ফলো-আপ) প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা

অনুসরণ (ফলো-আপ) প্রক্রিয়া কার্যক্রমের সফলতার চাবিকাঠি। অনুসরণ প্রক্রিয়া জোরদার না থাকলে যেকোনো সুন্দর কার্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সেই সাথে ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সাথে সাথে অনুসরণ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনায় নতুনত্ব আনা প্রয়োজন।

নতুন এই শিক্ষাদান পদ্ধতিতে অনুসরণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা নতুন এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যেখানে অধিক সংখ্যক অনুসরক নিয়োগ না করেও অনুসরণ জোরদার করা সম্ভব। যার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে একটি 'ছক'। এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এক নজরে দেখা যাবে -

● ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ● শিক্ষকের উপস্থিতি ● দৈনিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন ● সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ● শিক্ষকের দিনপঞ্জি

পূরণকৃত এসব 'ছক' অফিসে পেশ করা হলে অনেক সময় পরিদর্শক/সুপারভাইজার এসব দেখে অপরিদর্শনকৃত কেন্দ্র সমূহের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের কার্যক্রমের অগ্রগতি সহজে ধরতে পারবেন। এতে কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি নখদর্পণে থাকলে এর মধ্যে বিরাজিত অবস্থাগুলো সহজে দূর করা সম্ভব হবে।

উল্লেখিত বিষয়/বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানো যায় না। এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে উপ-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়েছে। যেমনঃ বুদ্ধিবৃত্তি যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

ক. মনোযোগ, খ. পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গ. স্মৃতি

এইভাবে প্রতিটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যর উপ-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে এর যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। রচনা করা হয়েছে সহজ ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে বই। এর জন্য তৈরি করা হয়েছে ১০ দিনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল।

দলভিত্তিক শিক্ষা

বাংলাদেশে জনসংখ্যার হার দ্রুত বেড়েই চলেছে। জনসংখ্যার এই দ্রুতগতির সাথে যেমন অর্থনৈতিক অবস্থার সামঞ্জস্য থাকতে পারছে না, তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র/শিক্ষকের হার গড়ে ১:৬২ জন দেখালেও অনেকক্ষেত্রে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে শিক্ষক/ছাত্রের হার দেখা যায় ১:৭০ থেকে ১:১০০ জন বা তদূর্ধ্বে।

বর্তমানে দেশের প্রকৃত চাহিদা অনুপাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেয়া হচ্ছে না। তাই কলা-কৌশলের মাধ্যমে কিভাবে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব তারই একটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ "দলভিত্তিক শিক্ষা"। পূর্বে আমাদের দেশে টোলে এ ধরনের শিক্ষা দিয়ে পণ্ডিত মশাই পড়া আদায় করতেন।

তখন একজন শিক্ষক দ্বারা নির্দিষ্ট পিরিয়ডের মধ্যে ৭০ থেকে ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে পাঠ দিয়ে পাঠ আদায় করার নিয়ম ছিল না। নিয়ম ছিল না পিরিয়ডের সংখ্যার। শিক্ষক শুধু জানতেন আজকের পড়া আজকেই শেষ করতে হবে।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি নতুনত্ব আনলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ঠিক রাখতে না পারায় বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারছে না। তাই বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এটিই একটি নতুন পদক্ষেপ।

একজন শিক্ষকের পক্ষে নির্দিষ্ট পিরিয়ডের মধ্যে ৭০ থেকে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষে পাঠ দিয়ে পাঠ আদায় করা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না। আবার বাড়িতে অনুকূল পরিবেশের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ তৈরিতে সুযোগ পায় না।

যার ফলে "দলভিত্তিক শিক্ষা" ব্যবস্থায় শিক্ষক সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীদের সাধারণ পাঠদানের ব্যবস্থা করবেন। পরে পাঠ আদায়ের জন্য ছাত্রছাত্রী যাতে শ্রেণীকক্ষে তাদের পাঠ সমাপ্ত করতে পারে, তার লক্ষ্যে প্রতি দশজনের একটি দল গঠন করা যেতে পারে। এক এক দলের এক একজন দলনেতা থাকবে। এই দলনেতা নির্বাচনে যে শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ায় ভালো, তাদেরকে নিযুক্ত করা যেতে পারে।

দলনেতা তার বাকি নয় জনের পড়া তৈরিতে সাহায্য করবে। সাথে সাথে নিজের পড়াও আয়ত্ত করবে। শিক্ষক শুধু দলনেতাদের পরিচালনার জন্য সচেষ্ট হবেন। কোনো দলনেতা ভুল করছে কিনা, সেটা তিনি দেখবেন। এতে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী শ্রেণীকক্ষে পাঠ দিয়ে যথাযথভাবে পাঠ আদায় করতে পারবেন। শ্রেণীকক্ষে জায়গার সংকুলান না হলে মাঠে গাছের নিচে বা অন্য স্থানেও পৃথক পৃথক দলের স্থান নির্বাচন করা যেতে পারে।

(সংক্ষেপিত)

“বাড়ির কাজ”
আর না